ইসলামের আলোকে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন

ড. যায়দ ইবন আবদুল করিম আয-যায়দ
প্রফেসর, তুলনামূলক ফিক্‌হ বিভাগ
ডীন, উচ্চতর বিচারিক ইনস্টিটিউট
ইমাম মুহাম্মদ ইবন সাউদ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় রিয়াদ
সৌদি আরব

COMITE INTERNATIONAL GENEVE
ICRC

রেফারেন্স

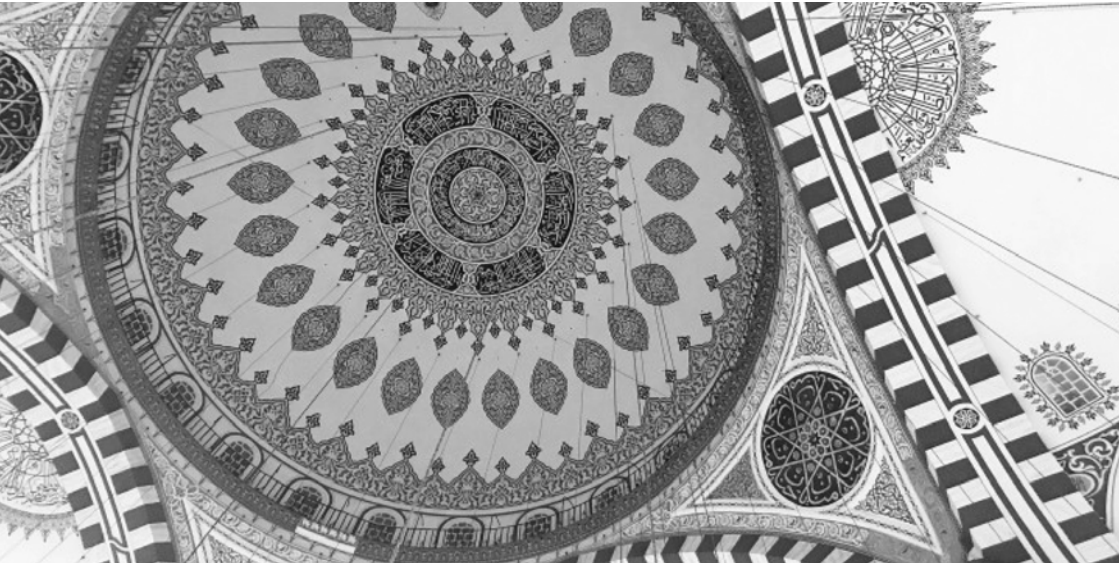

ইসলামের আলোকে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন

ড. যায়দ ইবন আবদুল করিম আয-যায়দ
প্রফেসর, তুলনামূলক ফিক্‌হ বিভাগ
ডীন, উচ্চতর বিচারিক ইনস্টিটিউট
ঈমাম মুহাম্মদ ইবন সাউদ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় রিয়াদ,
সৌদি আরব।

ইসলামের আলোকে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন

মূল
ড. যায়দ ইবন আবদুল করিম আয-যায়দ
প্রফেসর, তুলনামূলক ফিক্‌হ বিভাগ
ডীন, উচ্চতর বিচারিক ইনস্টিটিউট
ঈমাম মুহাম্মদ ইবন সাউদ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় রিয়াদ, সৌদি আরব।

ভাষান্তর
শরীয়াহ এবং ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ
আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

সম্পাদনা
প্রফেসর ড. মোঃ নাজমুল হক নাদভী
প্রাক্তন ডীন, শরীয়াহ এবং ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ
আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

ড. আ ক ম আবদুল কাদের
প্রফেসর এবং প্রাক্তন চেয়ারম্যান
আরবি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর এ বি এম আবু নোমান
ডীন, আইন অনুষদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

আমিনুল ইসলাম
আইসিআরসি, বাংলাদেশ

প্রকাশক
আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি, বাংলাদেশ
ও
শরীয়াহ এবং ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ
আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

সূচীপত্র

প্রথমত: ইসলামের দৃষ্টিতে যুদ্ধ ১১

দ্বিতীয়ত: ইসলামে আন্তর্জাতিক সাধারণ আইনের মূলনীতি ১৫

১. মানবিক ঐক্য ১৫
২. পারস্পরিক সহযোগিতা ১৬
৩. উদারতা ১৬
৪. বিশ্বাসের স্বাধীনতা ১৭
৫. ন্যায় বিচার ১৭
৬. সমাচরণ ১৮

তৃতীয়তঃ ইসলামে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের পরিভাষা ২৫

আহত ও বিপদগ্রস্তদের অধিকারসূহ সংরক্ষণ ৪৬
যুদ্ধবন্দীদের অধিকার ৪৯
নিখোঁজ ও নিহতদের অধিকার ৬৭
নিখোঁজ ও নিহতদের অধিকার ৬৭
বেসামরিক অধিবাসীদের অধিকার ৭৪

প্রথম অধ্যায় ৩১

ইসলামে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রসমূহ ৩১
এক: আহত ও বিপদগ্রস্তদের অধিকারসমূহ সংরক্ষণ ৩১
দুই: যুদ্ধবন্দীদের অধিকার ৩৩
তিন: নিখোঁজ ও নিহতদের অধিকার ৪৫
চার: বেসামরিক অধিবাসীদের অধিকার ৪৯

দ্বিতীয় অধ্যায় ৫৭

ইসলামে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের প্রায়োগিক দিক
(মডেল হিসেবে বদর যুদ্ধ) ৫৭
বদর যুদ্ধে মানবিক অবস্থানসমূহ ৫৯
প্রথমত: নিজ সৈনিকদের সাথে রাসূল সা. এর
আচরণের মানবিক দিকসমূহ ৫৯
দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধবন্দীদের সাথে রাসূলের সা. ৬২
আচরণ সংশ্লিষ্ট মানবিক দিকসমূহ

উপসংহার ৭২

গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্য সূত্র ৭৮

সম্পাদকীয়

পৃথিবীতে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করাই ইসলামের মূল আবেদন বিধায় সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে যুগে যুগে নবী-রাসুলগণ ঐশী বিধান নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন এবং সর্বশেষে মহানবী সা. মহাগ্রন্থ আল-কুরআন নিয়ে বিশ্বমানবতার দূতরূপে সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট রাহমত হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। কাউকে শাস্তি প্রদানের জন্য ইসলামের আবির্ভাব হয়নি বরঞ্চ সমগ্র বিশ্বে সকলের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই ইসলামের কাম্য বিধায় শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে তা দূরীকরণে বিভিন্ন বিধি-বিধান প্রনীত হয়েছে যা ইসলামি পরিভাষায় শরীয়াহ বা ইসলামি আইন হিসেবে পরিচিত। ইসলামি শরীয়াহ সর্বক্ষেত্রে মানব কল্যাণের উপর ভিত্তি করেই প্রণীত বিধায় ইসলামি শরীয়াহ'র প্রতিটি ক্ষেত্রে মানবাধিকার তথা মানবিক দিকসমূহ যথেষ্ট গুরুত্বসহকারে স্থান লাভ করেছে।

১৪২৫ হিজরীতে প্রকাশিত ড. যায়দ ইবন আবদুল করীম আয্-যায়দ কর্তৃক রচিত {مقدمة في القانون الدولي الإنساني في الإسلام} [ইসলামের আলোকে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন] শীর্ষক মূল আরবি গ্রন্থটি আমার পাঠ করার সুযোগ হয়েছিল। আকারে ছোট্ট হলেও মানবিক আইন বিষয়ে একটি চমৎকার গ্রন্থ বিধায় আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি-ঢাকা, বাংলাদেশ'র পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের শরীয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ'র যৌথ উদ্যোগে গ্রন্থটি বাংলাভাষায় রূপান্তর ও সম্পাদনার প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করি এবং সম্পাদনার দায়িত্ব নিজে রেখে আমার অনুজ প্রতীম সহকর্মী ও সাইন্সেস অব হাদিস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব নাজমুল হুদা সোহেলকে অনুবাদের দায়িত্ব প্রদান করি।

ভাষান্তর খুবই কষ্টসাধ্য বিশেষ করে আরবি ভাষার ক্ষেত্রে তা আরো দুরূহ কর্ম। বাংলা ভাষায় অনেক আরবি প্রতিশব্দ পর্যাপ্ত না থাকায় বাংলায় ভাষান্তর অত্যান্ত জটিল। তবে আল্লাহর রাহমতে অনুবাদক গ্রন্থটি আরবি ভাষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রাঞ্জল ও সহজ-সরল বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন যা সম্মানিত পাঠকদের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে বলে আমার আশা ও বিশ্বাস।

মানবিক দুর্বলতা ও জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে নানাবিধ ত্রুটি-বিচ্যুতি অগোচরে থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। কোনো ভুল-ত্রুটি সম্মানিত পাঠক সমাজের কারো

নজরে এলে প্রকাশক আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি অবগত করা হলে তা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করার সুযোগ থাকবে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের প্রফেসর ড. আ ক ম আবদুল কাদের গ্রন্থটির অনুবাদকর্ম রিভিউ করেছেন এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডীন প্রফেসর এ বি এম আবু নোমান আইনগত দিক দেখাশুনা করেছেন। তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

"ইসলামের আলোকে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন" শিরোনামের ব্যতিক্রমধর্মী গবেষণামূলক অনুবাদ গ্রন্থটি বাংলাভাষাভাষী আইনের শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জ্ঞানভান্ডারে নতুন মাত্রা যোগ করবে, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন বিষয়ে নতুনদ্বার উন্মোচিত হবে বলে আমার দৃঢ় আশা ও বিশ্বাস। আল্লাহ আমাদের সকলকে আইনের পথে পরিচালিত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমীন।

প্রফেসর ড. মোঃ নাজমুল হক নাদভী
প্রাক্তন ডীন, শরীয়াহ এবং ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ
আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

প্রাথমিক কথা

আমাকে এই বইয়ের ভূমিকা লেখার জন্য বলা হয়েছে। ব্যাপারটি আমার জন্য গর্বের ও সম্মানের। কারণ, বইটি প্রকাশ করছে 'আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি'র আরব উপদ্বীপ শাখার আঞ্চলিক মিশন। তাছাড়া, বইটি 'ইসলামের দৃষ্টিতে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন' শীর্ষক বিষয়ের ভূমিকা হিসেবে কাজ করবে। আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের দীর্ঘ যাত্রার সূচনা হয় ১৮৬৪ সালের প্রথম জেনেভা কনভেনশনের মাধ্যমে, যা যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সশস্ত্র বাহিনীর অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে সম্পাদিত হয়েছিলো। ১৩০ বছরেরও বেশি দীর্ঘ এই যাত্রায় অনেক চুক্তি সম্পাদিত হয়, যা যুদ্ধ ও সশস্ত্র সংঘাতে আক্রান্তদের বাঁচাতে কিছু মূলনীতি গঠনে ভূমিকা পালন করে। এক পর্যায়ে ১৯৯৮ সালে রোম চুক্তির আলোকে 'স্থায়ী আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল' প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সব চুক্তির মূল বিষয় ছিলো, আন্তর্জাতিক ও রাষ্ট্রীয় সব ধরনের সশস্ত্র সংঘাতে আক্রান্তদের বাঁচাতে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন গঠন করা, যদিও এর মূল উদ্দেশ্য ছিলো স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক যুদ্ধের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে জনগনকে মুক্ত করে মানবিক মর্যাদা সংরক্ষণ করা। এখানে যেসব মূলনীতি প্রণীত হয়েছিল, সেগুলো বস্তুত সকল শরীয়াহ ও ধর্মীয় বিধান হতে উৎসারিত, যা মানুষের জন্য তার মর্যাদা, আত্মিক পরিশুদ্ধি ও সার্বজনীন শান্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রহমত হিসেবে অবতীর্ণ হয়।

আর আমি যে গ্রন্থের ভূমিকা উল্লেখ করছি সেটির উদ্দেশ্য হলো ইসলামি শারীয়াহ'র আলোকে মানবিক মূল্যবোধগুলোর উপস্থাপন। যিনি স্বেচ্ছায় এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের আঞ্জাম দিয়েছেন তিনি হলেন, মুহাম্মাদ ইবন সাউদ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ফিকহ বিভাগের প্রফেসর ও উচ্চতর বিচারিক ইনস্টিটিউট এর ডীন ড. যায়দ ইবন আবদুল করিম আয-যায়দ। তিনি এই গবেষণার মাধ্যমে ইসলামের দৃষ্টিতে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনকে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। আমরা তাঁর এই মহতি প্রয়াসের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই। কারণ পরবর্তীতে যারা এই বিষয়গুলো অবলম্বনে অধ্যয়ন করবেন গ্রন্থটি তাদের জন্য পথ প্রদর্শক হিসেবে বিবেচিত হবে।

'আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি' উনবিংশ শতাব্দির মাঝামাঝি তার সূচনালগ্ন থেকেই আন্তর্জাতিক মানবিক আইন গঠন, উন্নয়ন ও তার প্রচার প্রসারে প্রতিটি দেশকে উদ্বুদ্ধ করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় কমিটি এই বইটি প্রকাশে

উদ্যোগ গ্রহন করেছে এবং লেখকের এই মহৎ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে। আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি একটি নিরপেক্ষ ও স্বাধীন সংস্থা। ১৯৪৯ সালে অনুষ্ঠিত চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনে প্রায় ১৯১টি দেশকে সংস্থাটির সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে সংযুক্ত করা হয়। ১৯৭৭ সালে যুক্ত হওয়া দু'টি প্রটোকলের মূল বিষয় ছিলো, সশস্ত্র সংঘাতে দুর্গতদের সহযোগিতা ও রক্ষা করা।

আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরপরই এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সংস্থাটির পরিচয় বহন করে এমন একটি প্রতীকের প্রয়োজনবোধ করে, যার উদ্দেশ্য কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদের রক্ষা করা নয়; বরং যারা একাজে নিয়োজিত তাদের নিরাপত্তাও নিশ্চিত করা। পাশাপাশি এর অন্তর্গত সকল ইউনিটের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। আর এই প্রতীক দেখামাত্রই বিবাদমান পক্ষগুলো এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে। ১৮৬৩ সালের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সুইস জাতীয় পতাকার আদলে সাদা কাপড়ের উপর ক্রসযুক্ত নিদর্শনকে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি'র প্রতীক হিসেবে নির্বাচন করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। পরের বছরে অনুষ্ঠিত রেড ক্রস এর কুটনৈতিক সম্মেলনে সৈন্যদের মাঝে টিম হিসেবে কাজ করার জন্য এই চিহ্নকে প্রতিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় যা ১৮৬৪ সালের জেনেভা কনভেনশনে চুড়ান্ত হয়। এরপর ১৮৭৬ সালে ওসমানীয় সাম্রাজ্য কর্তৃক রেড ক্রসের পরিবর্তে 'রেড ক্রিসেন্ট'কে মুসলিম বিশ্বে আন্তর্জাতিক কমিটি'র প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি মিলে ১৯২৯ সালে। এ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমানে এ দু'টি চিহ্নই মানবতার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত যার কোনো ধর্মীয় পরিচয় নেই। অবশেষে আমি আবারো প্রফেসর ড. যায়দ ইবন আবদুল করিম আয-যায়দেকে এই মহতি কাজের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, যিনি আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটিকে এই বইটি প্রকাশ করতে সাহায্য করেছেন।

কুয়েত, ৮ জিলকদ- ১৪২৫ হিজরী মোতাবেক ২০ ডিসেম্বর-২০০৪ খ্রিষ্টাব্দ।

মিশেল মির
আঞ্চলিক প্রধান
আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি, কুয়েত

লেখকের মুখবন্ধ

সশস্ত্র সংঘাতের যুগে মানবাধিকার সমস্যাটি স্কলার ও চিন্তাবিদদের চিন্তার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ মানবজাতি বাড়াবাড়ি, নিপীড়ন ও যুদ্ধ-বিগ্রহ দ্বারা আক্রান্ত। সভ্যতার এই যুগে এই বিষয়টি অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। যার অন্যতম উদাহরণগুলো হচ্ছে, জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি, লেবনানের সাবরা ও সাতিলা ক্যাম্প, ইরাকের হালাবজা, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা, কসোভো, কাশ্মীর, চেচনিয়া, ফিলিস্তিনের জেনিন এইসব এলাকাগুলোতে ঘটে যাওয়া সংঘাত ও আক্রমণগুলো। মানুষের মনে একটি প্রশ্ন আজ ঘুরে ফিরে আসছে- কোথায় মানবাধিকার?

এই সকল সংঘাতের কারণে মানুষ তার মানবিকতা, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা হারিয়ে ফেলে। ইতিহাস সাক্ষী, যুদ্ধ-বিগ্রহ ব্যক্তি ও সমাজের ন্যূনতম অধিকারগুলো হরণের মাধ্যমে তাদের মানবিক মূল্যবোধকে কিভাবে অতিমাত্রায় হুমকির সম্মুখীন করে ফেলে। তখন মানুষ মূল্যবোধহীন হয়ে যায়। আর আধুনিক যুগে এসব মারাত্মক বিষয়গুলো বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদদের যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে চিরন্তন মানবিক মূল্যবোধগুলো উদ্ধার করতে বাধ্য করেছে।

এই বইটি কুরআন-হাদিসের বাণী, স্কলারদের মতামত ও সমসাময়িক গবেষণার উপর ভিত্তি করে রচিত একটি ছোট্ট গবেষণা, যার প্রতিপাদ্য বিষয় হলো সশস্ত্র সংঘাতের সময় ইসলামের আলোকে মানবাধিকার কিংবা আন্তর্জাতিক মানবিক আইন কি হতে পারে তা ফুটিয়ে তোলা। আশা করা যায়, এক্ষেত্রে গবেষণাটি পরবর্তিদের কাজে আসবে। এ বিষয়ে চিন্তা করলে দেখা যাবে, 'আন্তর্জাতিক মানবিক আইন' একটি আধুনিক পরিভাষা যদিও এর মূল বিষয় ও ক্ষেত্র আগে থেকেই পরিচিত।

এই বিষয়টিকে ইসলামিক স্টাডিজের বিজ্ঞ গবেষকগণ আস-সিয়ার ওয়াল মাগাজি (السيروالمغازي) নামে অভিহিত করেন। 'السير' নামে অভিহিত করার কারণ হিসেবে 'মাবসূত' নামক গ্রন্থে ইমাম সারাখসী র. উল্লেখ করেনঃ 'السير' শব্দটি سيرة এর বহুবচন (যার অর্থ জীবনী, চালচলন, আচরণ ইত্যাদি)। যেহেতু এই বইটি 'আহলে হারব' বা যুদ্ধরত পক্ষ ও 'আহলে আহদ' বা চুক্তিবদ্ধ পক্ষের সাথে মুসলিমদের আচরণ ব্যাখ্যা করে তাই এর নাম দেয়া হয়েছে 'السير' । আর 'المغازي'(যুদ্ধ) নামে নামকরণ করা হয়েছে কারণ, এর মূলনীতিগুলো

রাসুল সা. এর যুদ্ধগুলো থেকে উৎসারিত[১]। প্রখ্যাত ইমাম মুহাম্মাদ ইবন হাসান আশ-শায়বানীও এই বিষয়ে السير শিরোনামে একটি বই লিখেন, যার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম সারাখসী র. 'ইসলামের দৃষ্টিতে মানবিক আইন' বিষয়ক পাঁচ খন্ডের একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তবে আইন বিশারদদের বইগুলোতে এই বিষয়টি 'যুদ্ধনীতি' কিংবা 'সশস্ত্র সংঘাতনীতি' পরিভাষায় পরিচিতি পেয়েছে। পরিভাষাটি অতি দ্রুত প্রসিদ্ধি লাভ করে, ফলে বিভিন্ন বই ও আধুনিক গবেষণাসমূহেও এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি এ নিয়ে অনেক আঞ্চলিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সেমিনার ও কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়েছে। আর এর বিভিন্ন প্রচার ও প্রকাশনার মাধ্যমে এটি সবার মাঝে দ্রুতই বিস্তার ও পরিচিতি লাভ করেছে।

যদিও এই গবেষণাটি নির্ধারিত বিষয়ের পূর্ণ ধারণা প্রদান করেনি, তারপরও লেখক বর্ণনামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করে বিষয়টিকে বোধগম্য করে উপস্থাপন করেছেন এবং এমন কিছু অসাধারণ মূলনীতি দাঁড় করিয়েছেন যা দিয়ে বিষয়টির মোটামোটি ধারণা পাওয়া যাবে। এই গবেষণায় দু'ধরণের মূলনীতি উঠে এসেছে। কিছু মূলনীতি কাজে আসবে সশস্ত্র সংঘাত চলাকালীন। আর কিছু বিবেচিত হবে ব্যক্তি, স্থান ও সম্পদ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যার সাথে যুদ্ধক্ষেত্রের কোনো সম্পর্ক নেই।

গবেষণার বিষয়বস্তুগুলো নিম্নরূপ:

* ভূমিকা: এতে তিনটি উপাদান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তা হলো:

- ইসলামের দৃষ্টিতে যুদ্ধ।
- ইসলামে আন্তর্জাতিক সাধারণ আইনের মূলনীতি ।
- ইসলামে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের পরিভাষা ।

* প্রথম অধ্যায়ঃ ইসলামে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের ক্ষেত্রসমূহ।

* দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের প্রয়োগ (মডেল হিসেবে বদর যুদ্ধ)।

---

১ দ্রষ্টব্য, মুহাম্মদ ইবন আবী সাহল আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, প্র.বি (বৈরুত: দারুল মা'রিফা, ১৪০৬ হি.) ২/১০।

* উপসংহার

পরিশেষে এই বইটি পড়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য আমি দু'জন ব্যক্তির কাছে কৃতজ্ঞ। একজন হলেন পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কূটনীতি অধ্যয়ন ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. মুতাব ইবন সালিহ আল-আশইয়ুভী। আর আরেকজন হলেন, 'রেড ক্রস আন্তর্জাতিক কমিটি'র মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকা বিষয়ক উপদেষ্টা মিশনের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী সম্মানিত প্রফেসর শরীফ আতলাম। এই কাজে আল্লাহর সাহায্য ও তাওফীক কামনা করছি এবং রাসুল সা. এর প্রতি সালাত পেশ করছি।

১২/০৬/১৪২৫ হিজরী।

প্রফেসর ড. যায়দ ইবন আব্দুল করিম আয-যায়দ
অধ্যাপক, তুলনামূলক ফিকহ বিভাগ
ডীন, উচ্চতর বিচারিক ইনস্টিটিউট
ঈমাম মুহাম্মদ সাউদ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ, সৌদি আরব
ই-মেইল: azzaid77@hotmail.com

প্রথমত: ইসলামের দৃষ্টিতে যুদ্ধ

মুসলিম ও অন্যান্য জাতির সাথে সম্পর্কের মূলনীতি হলো পারস্পারিক শান্তি[২]। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা পুরোপুরি ইসলামে প্রবেশ করো"[৩] কিন্তু মানুষের মাঝে এমনও লোক আছে যাদেরকে শিক্ষা-প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজ হয় না এবং যাদেরকে আইন নিবৃত্ত করতে পারে না। কোনো কোনো জাতি নিজের শক্তিমত্তায় অন্ধ হয়ে থাকে এবং শত্রুতা ও আধিপত্যবাদের ছোবলে প্রতিবেশী দেশগুলোকে দুর্বল করে দিতে চায়। এমতাবস্থায় সীমালঙ্ঘনকারীকে নিবৃত্ত করতে, স্বাধীনতা ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে শক্তি প্রয়োগের বিধান প্রবর্তন আবশ্যিক হয়ে পড়ে। এরূপ পরিস্থিতিতেই ইসলামে যুদ্ধের বিধান প্রবর্তিত হয়েছে। সূতরাং্ ইসলামে যুদ্ধের লক্ষ্য হলো, মানুষের অধিকারসমূহের সুরক্ষা প্রদান করা। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেন:

﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴾

"(হে ঈমানদারগণ!) কাফিরদের সাথে এমন যুদ্ধ করো যেন গোমরাহী ও বিশৃঙ্খলা নির্মূল হয়ে যায় এবং দ্বীন পুরোপুরি আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়।"[৪]

তাই যদি শত্রু অত্যাচার ও সীমালঙ্ঘন হতে বিরত থাকে এবং মানুষের ধর্ম নিয়ে ফিতনা না ছড়ায় তাহলে যুদ্ধ করা বৈধ হবে না [৫]। কারণ আল্লাহ বলেন,

﴿فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾

২ দ্রষ্টব্য: ওহাবা আয যুহাইলী, আছারুল হারবি ফিল ফিকহিল ইসলামি, ৩য় সংস্করণ (দামেস্ক: দারুল ফিকর ১৪১৯হি.) পৃ. ১৩২ ও মুস্তফা আস-সিবাঈ, নিজামুস সিলমি ওয়াল হারবি ফিল ইসলাম, পৃ. ২৯।

৩ আল-বাকারহ: ২০৮।

৪ আল-আনফাল: ৩৯।

৫ দ্রষ্টব্য: মুস্তফা আস-সিবাঈ, নিজামুল সিলমী ওয়াল হারবি ফিল ইসলাম, দ্বিতীয় সংস্করণ (রিয়াদ: মাকতাবাতুল ওয়াররাক, ১৪১৯ হি.) পৃ. ৩৬।

"তারপর যদি তারা বিরত হয় তাহলে জেনে রাখো যালিমদের ছাড়া আর করোর ওপর হস্তক্ষেপ করা বৈধ নয়।"[৬] এ কারণেই শত্রুর পক্ষ থেকে সূচিত বাড়াবাড়ি প্রতিরোধ, চুক্তির ভিত্তিতে সাব্যস্ত অধিকার প্রতিপক্ষ কর্তৃক লঙ্ঘিত হলে তা রক্ষা করা, ধর্মীয় স্বাধীনতাকে নিরাপদ করা অথবা যারা ইসলামে প্রবেশ করতে চায় তাদের পথকে কন্টকমুক্ত করা ছাড়া ইসলামে যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার নিয়ম নেই। আর কুরআনের যেসব আয়াতসমূহে সকল কাফিরকে হত্যা করার কথা সাধারণভাবে এসেছে তা একান্তই বিশেষ প্রসঙ্গের সাথে সম্পর্কিত। যদি এ সংক্রান্ত সবগুলো আয়াত সামনে রাখা হয় তাহলে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।[৭]

এতদসত্ত্বেও ইসলামে মানুষের মর্যাদা সুরক্ষিত এবং চরিত্র ও মূল্যবোধের দিকটি বিশেষভাবে সমাদৃত। যেমনটি আমরা সুলায়মান ইবন বুরাইদা তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত হাদিসে দেখতে পাই। তিনি বলেন,

"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ "اغْزُوا بِسْمِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، اغْزُوا وَلا تَغْدُرُوا وَلا تَغْلُوا وَلا تُمَثِّلُوا وَلا تَقْتُلُوا وَلِيدًا ، وَإِذَا أَنْتَ لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى أَحَدِ ثَلاثِ خِلالٍ وَخِصَالٍ ، فَأَيَّتَهُنَّ مَا أَجَابُوا إِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ إِلَيْهِنَّ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ إِنْ هُمْ فَعَلُوا أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ ، وَإِنْ هُمْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، وَلا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ شَيْءٌ إِلا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا أَنْ يَدْخُلُوا فِي الإِسْلامِ فَسَلْهُمْ إِعْطَاءَ الْجِزْيَةِ ، فَإِنْ فَعَلُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ ، وَإِنْ حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৬ আল-আনফাল: ১৯৩।

৭ দ্রষ্টব্য: সাঈদ ইসমাইল চীনি, হাকিকাতুল আ'লাকা বাইনাল মুসলিমীন ওয়া গাইরিল মুসলিমীন, প্রথম সংস্করণ (বৈরুত: মুআসসাতুর রিসালাহ, ১৪২০ হি.) পৃ. ৪২ ও তৎপরবর্তী।

فَلا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلا ذِمَّةَ نَبِيِّكَ ، وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَبِيكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ ، فَإِنَّكُمْ إِنْ تَخْفِرُوا ذِمَّتَكُمْ وَذِمَّةَ آبَائِكُمْ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ مِنْ أَنْ تَخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّكُمْ ، وَإِنْ حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ وَأَرَادُوا أَنْ يَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلا تُنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ ، وَلَكِنْ أَنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لا تَدْرِي هَلْ تُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اللَّهِ تَعَالَى أَمْ لا"

"রাসূলুল্লাহ সা. যখন কোন সেনাবাহিনী কিংবা সেনাদলের উপর আমীর নিযুক্ত করতেন তখন বিশেষতঃ তাকে আল্লাহ তায়ালা কে ভয় করে চলার উপদেশ দিতেন এবং তাঁর সঙ্গী মুসলিমদের প্রতি আদেশ করতেন তারা যেন ভালোভাবে চলে। আর (বিদায়লগ্নে) বলতেন, যুদ্ধ করো আল্লাহর নামে, আল্লাহর পথে। লড়াই করো তাদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহর সঙ্গে কুফরী করে। যুদ্ধ চালিয়ে যাও, তবে গনীমতের মাল আত্মসাৎ করবে না, চুক্তি ভঙ্গ করবে না, শত্রু পক্ষের অঙ্গ বিকৃত করবে না, শিশুদেরকে হত্যা করবে না, যখন তুমি মুশরিক শত্রুর সম্মুখীন হবে তখন তাকে তিনটি বিষয় বা আচরণের প্রতি আহবান জানাবে। তারা এগুলোর মধ্য থেকে যেটিই গ্রহণ করে, তুমি তাদের পক্ষে থেকে তা মেনে নিবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়াবে। প্রথমে তাদের ইসলামের দিকে দাওয়াত দিবে। যদি তারা তোমার এ আহ্বানে সাড়া দেয় তবে তুমি তাদের পক্ষ থেকে তা মেনে নিবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে সরে দাঁড়াবে। এরপর তুমি তাদের বাড়ি-ঘর ছেড়ে মুহাজিরদের এলাকায় (মদিনায়) চলে যাওয়ার আহ্বান জানাবে এবং তাদের জানিয়ে দিবে যে, যদি তারা তা কার্যকরী করে, তবে মুহাজিরদের জন্য যেসব সুযোগ-সুবিধা ও দায়-দায়িত্ব রয়েছে, তা তাদের উপরও কার্যকরী হবে। আর যদি তারা বাড়ি-ঘর ছেড়ে যেতে অস্বীকার করে, তবে তাদের জানিয়ে দেবে যে, তারা সাধারণ বেদুঈন মুসলিমদের মত গণ্য হবে। তাদের উপর আল্লাহর সে বিধান কার্যকরী হবে, যা মু'মিনদের উপর কার্যকরী হয় এবং তারা গনীমত ও ফাই থেকে কিছুই পাবে না। অবশ্য মুসলিমদের সঙ্গে শামিল হয়ে যুদ্ধ করলে তারা তার অংশীদার হবে। আর যদি ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তাদের কাছে জিযয়াহ প্রদানের দাবী জানাবে। যদি তারা তা গ্রহণ করে নেয়, তবে তুমি তাদের পক্ষ থেকে তা মেনে নিবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবে। আর যদি তারা এ দাবী না মানে তবে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আর যদি তুমি কোনো দুর্গবাসীকে অবরোধ করো এবং তারা

যদি তোমার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যিম্মাদারী চায়, তবে তুমি তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যিম্মাদারী মেনে নিবে না। বরং তাদেরকে তোমার এবং তোমার সাথীদের যিম্মাদারীতে রাখবে। কেননা তারা যদি তোমার ও তোমার সাথীদের যিম্মাদার ভঙ্গ করে, তবে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যিম্মাদারী ভঙ্গের চাইতে কম গুরুতর। আর যদি তোমরা কোনো দুর্গের অধিবাসীদের অবরোধ করো, তখন যদি তারা তোমাদের কাছে আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক নেমে আসতে চায়, তবে তোমরা তাদেরকে আল্লাহর হুকুমের উপর নেমে আসতে দিবে না, বরং তুমি তাদেরকে তোমার সিদ্ধান্তের উপর নেমে আসতে দেবে। কেননা তোমার জানা নেই যে, তুমি তাদের বিষয়ে আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়িত করতে পারবে কি না?"[৮]

এই হাদিসটিতে যুদ্ধ সংঘটনের ব্যাপারে ইসলামের সামগ্রিক অবস্থানের একটি ছাপ খুঁজে পাওয়া যায়। শত্রুদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে নৈতিক অবস্থান কি হবে যুদ্ধপূর্ব ঘোষণায় তাও বিধৃত হয়েছে। এটিই অত্র অনুচ্ছেদের মূল বক্তব্য।

[৮] মুসলিম, সহীহ মুসলিম, জিহাদ ও এর নীতিমালা অধ্যায়, ৩/১৩৫৭

দ্বিতীয়ত: ইসলামে আন্তর্জাতিক সাধারণ আইনের মূলনীতি

আন্তর্জাতিক সাধারণ আইন হলো, এমন কতিপয় সুশৃঙ্খল নিয়মনীতির সমষ্টি যা যুদ্ধ কিংবা শান্তি যে কোনো অবস্থায় আন্তর্জাতিক আইন সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সম্পর্ক নির্ধারণ করে। অতীতকাল থেকেই আন্তর্জাতিক সাধারণ আইনের মূলনীতির প্রধান উৎসগুলো হচ্ছে আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ, প্রচলিত প্রথা, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক স্বীকৃত সাধারণ আইনের ভিত্তিসমূহ। যেমন, ক্ষয়ক্ষতির প্রভাব (فاعل الضرر) সম্পর্কিত দায় দায়িত্ব এবং সম্পাদিত চুক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শণের নীতি।[৯]

এ হলো সামগ্রিক আইন। আর ইসলামে আমরা দেখতে পাই, রাসূলুল্লাহ সা. মদীনায় সর্বপ্রথম ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহের সাথে বিভিন্ন চুক্তি করেছেন, তাদের সাথে লেনদেন করেছেন এবং এভাবে তাদের মাঝে একটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এই সম্পর্কগুলোর অবশ্যই কিছু মূলনীতি ছিল যা তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতো। আর এই মূলনীতিগুলোই ইসলামের দৃষ্টিতে আন্তর্জাতিক সাধারণ আইনের প্রতিনিধিত্ব করে।[১০] সূতরাং বলা যায়, আন্তর্জাতিক ইসলামি সাধারণ আইন হলো ইসলামি শরীয়াহ'র এমন কিছু মূলনীতি যা কোনো ইসলামি রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে অনুসরণ করে থাকে। ইসলামের দৃষ্টিতে আন্তর্জাতিক সাধারণ আইনের প্রধান প্রধান মূলনীতি নিম্নরূপ:

১. মানবিক ঐক্য:

ইসলামি শরীয়াহ মনে করে সকল মানুষ মিলেই একটি জাতি, যা মনুষ্যত্বকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। আর তাদের মধ্যকার জাতিগত, বংশগত ও গোত্রীয় পার্থক্য কেবল পারস্পারিক পরিচয় ও সহযোগিতার লক্ষ্যে। পারস্পরিক মর্যাদার মানদন্ড তো আলাদা। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

---

৯ দ্রষ্টব্য: আবদুল করিম যায়দান, নাজরাতুন ফিশ শারীয়াহ, পৃ. ১১৯-১২০।

১০ আবদুল করিম যায়দান, নাজরাতুন ফিশ শারীয়াহ আল ইসলামিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ (বৈরুত: মুআসসাতুর রিসালাহ, ১৪২১ হি.) পৃ. ১৪০।

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

"হে মানব জাতি, আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ এবং একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে দিয়েছি যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। তোমাদের মধ্যে যে অধিক পরহেজগার সে-ই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদার অধিকারী"।[১১]

২. পারস্পরিক সহযোগিতা:

"ভালো কাজে পারস্পরিক সহযোগিতা" ইসলামে খুবই মর্যাদাসম্পন্ন একটি মূলনীতি। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

"নেকী ও আল্লাহভীতির সমস্ত কাজে সবার সাথে সহযোগিতা করো এবং গুনাহ ও সীমালংঘনের কাজে কাউকে সহযোগিতা করো না।"[১২]

৩. উদারতা:

ইসলামি শরীয়াহ সকলের সাথেই উদারতার কথা বলে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

﴿فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا﴾ "তোমরা ক্ষমা ও উপেক্ষার নীতি অবলম্বন করো"।[১৩] আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন: ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾ "এবং যারা ক্রোধ দমন করে ও অন্যের দোষ-ত্রুটি মাফ করে দেয়"।[১৪] তিনি আরো বলেন, হে নবী, সৎ কাজ ও অসৎ কাজ সমান নয়। তুমি অসৎ কাজকে

---

১১ আল- হুজরাত: ১৩।

১২ আল-মায়িদাহ: ০২।

১৩ আল-বাকারাহ: ১০৯।

১৪ আলে ইমরান: ১৩৪।

সেই নেকী দ্বারা নিবৃত্ত করো যা সবচেয়ে ভালো। তাহলে দেখবে যার সাথে তোমার শত্রুতা ছিল সে অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গিয়েছে।"[১৫]

৪. বিশ্বাসের স্বাধীনতা:

ইসলামি শরীয়াহ বিশ্বাসের স্বাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ধর্মের ক্ষেত্রে জবরদস্তিকে নিষেধ করে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ :

﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾

"ধর্মের ক্ষেত্রে জবরদস্তি করা যাবে না" [১৬]। অধিকন্তু কোন অমুসলিম ইসলামি রাষ্ট্রে আশ্রয় চাইলে রাষ্ট্র বরং তাদের সহযোগিতা করে এবং তাদেরকে জোরপূর্বক ধর্ম পরিবর্তন করার যে কোনো হস্তক্ষেপকে বারণ করে।

৫. ন্যায় বিচার:

ইসলামি শরীয়াহ শান্তি কিংবা যুদ্ধ সর্বাবস্থায় ন্যায় বিচারকে স্বীকৃতি দেয় ও তার ভিত্তিতে বিচার কার্য পরিচালনার কথা বলে। প্রতিটি মানুষের সাথেই ন্যায় ভিত্তিক আচরণ করার জন্য মুসলমানদের আদেশ করা হয়েছে। আল্লাহর বানী:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾

"হে ঈমানদারগণ! ইনসাফের পতাকাবাহী ও আল্লাহর সাক্ষী হয়ে যাও, তোমাদের ইনসাফ ও সাক্ষ্য তোমাদের নিজেদের ব্যক্তিসত্তার বিরুদ্ধে গেলেও।"[১৭]

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾

---

১৫ ফুসসিলাত/হা-মীম আল-সাজদাহ: ৩৪।

১৬ আল-বাকারাহ:২৫৬।

১৭ আন-নিসা: ১৩৫।

"কোনো দলের শত্রুতা তোমাদেরকে যেন এমন উত্তেজিত না করে দেয় যার ফলে তোমরা ইনসাফ থেকে সরে যাও ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠি করো এটি আল্লাহভীতির সাথে বেশী সামঞ্জস্যশীল"।[১৮]

৬. সমাচরণ:

পারস্পরিক আচরনের ক্ষেত্রে ইসলাম "সমাচরণ" মূলনীতিকে সমর্থন করে। তবে সেটি অবশ্যই নৈতিকতার আওতাধীন থাকতে হবে। সমাচরণনীতির ভিত্তিতে আচরণ করতে গিয়ে কখনো যদি অন্যায্য ও নৈতিক মূল্যবোধ পরিপন্থী কোনো কাজ করতে হয় তবে সে কাজ বন্ধ করা আবশ্যক। যেমন শত্রুরা যদি মুসলিম ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নিপীড়নমূলক কর আরোপ করে কিংবা কিছু মুসলিমের সম্পদ নষ্ট করে সেক্ষেত্রে সমাচরণ করা মুসলমানদের জন্য কখনোই বৈধ হবে না। অনুরূপ কেউ মিথ্যা বললে তার প্রতিক্রিয়ায় মিথ্যা বলা অথবা কেউ খেয়ানত করলে পাল্টা তার সাথে খেয়ানত করা মুসলমানদের জন্য বৈধ নয়।[১৯]

এ জাতীয় অবস্থায় আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ফকীহগণ সম প্রতিক্রিয়া না দেখানোর কথা বলেছেন। কারণ অমুসলিম রাষ্ট্রের এরূপ আচরন শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা এবং এ ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করা বৈধ নয়। কেননা এটি জুলম এবং জুলমকে অনুসরণ করা যায় না। তাছাড়া আমাদেরকে নিকৃষ্ট চরিত্র ধারণ করতে নিষেধ করা হয়েছে, যদিও শত্রুরা তেমন চরিত্রের অনুসারী হয়।[২০]

এই সাধারণ মূলনীতিসমূহের উৎস হলো কুরআন ও সুন্নাহ থেকে উৎসারিত শরীয়াহ'র নস (বাণী) এবং স্বীকৃত প্রথা বা প্রচলন। শরীয়াহ'র দলীলসমূহে আমরা এমন অনেক আয়াত ও হাদীস খুঁজে পাই যেখানে ইসলামি রাষ্ট্রের সাথে অন্যান্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক বিষয়ে নির্দেশনা রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ: মহান আল্লাহর বাণী,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾

---

১৮ আল-মায়িদাহ:০৮।

১৯ আস-সা'দী, তাফসীরুস সা'দী, ১/৪৫২।

২০ আস-সারাখসী, আল মাবসূত ২/২০০, ওমর আল আশক্বার, তারিখুল ফিক্বহিল ইসলামি, তৃতীয় সংস্করণ (কুয়েত: মাকতাবাতুল ফালাহ্, ১৪১৩ হি.) পৃ. ২৮-২৯; আবদুল করিম যায়দান, নাজরাতুন ফিশ্ শারীয়াহ, পৃ. ১৪৯-১৫০।

"হে ঈমানদারগণ অঙ্গীকারগুলো পুরোপুরি মেনে চলো"।[২১]

এই আয়াতটি সাধারণভাবে সকল প্রকার অঙ্গীকার পূরণের নির্দেশ দেয়। রাষ্ট্রসমূহ পরস্পরের সাথে যেসব অঙ্গীকার করে তা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে শরীয়াহ ইসলামি রাষ্ট্রকে অন্য যে কোনো রাষ্ট্রের সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করার আদেশ প্রদান করে। এই দলীলের পাশাপাশি অনেক নস (বাণী) পাওয়া যায় যেখানে অঙ্গীকার ভঙ্গ বা খেয়ানতের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ "নিশ্চয়ই আল্লাহ খেয়ানতকারীকে পছন্দ করেন না"।[২২]

তিনি আরো বলেন, ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا﴾ "আল্লাহ খেয়ানতকারী পাপীকে পছন্দ করেন না"।[২৩] সব ধরনের খেয়ানতই ঘৃণিত কাজ, হোক সেটি ব্যক্তিগত কিংবা আন্তর্জাতিক। তবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ বেশি মারাত্মক। কারণ তার পরিধি ও ব্যাপকতা অনেক বিস্তৃত।

অনুরূপ এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: "মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি। যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে, আমানত রাখলে খেয়ানত করে"।[২৪] সূতরাং একজন মুসলিম মিথ্যা কথা বলবে না, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে না, তার কাছে কেউ আমানত রাখলে তা খেয়ানত করবে না, সে শত্রু, মিত্র, রাষ্ট্র, ব্যক্তি যেই হোক না কেন।

ইসলামে এ জাতীয় প্রচুর নস (বাণী) রয়েছে, যার সবগুলো থেকেই সাধারণভাবে ব্যক্তিসমষ্টির মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক অথবা ইসলামি রাষ্ট্রের সাথে অন্যান্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক বিষয়ে নির্দেশনা নেওয়া যায়। উপরিউক্ত দলীলসমূহ থেকে আরেকটি বিষয় বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সা. তাঁর মূলনীতিগুলোকে বাস্তবেও কিভাবে প্রয়োগ করেছেন। মদীনার ইহুদীদের সাথে, মক্কায় অবিশ্বাসী কুরাইশদের সাথে বা নাজরানের খ্রীস্টানদের সাথে তাঁর কৃত চুক্তিসমূহ কিংবা বিভিন্ন যুদ্ধে প্রেরণের আগে সেনা প্রধানদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত উপদেশসমূহ এর যথার্থ প্রমাণ।

অন্যদিকে "উরফ" বা সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথা এর গ্রহযোগ্যতা ও মর্যাদা সম্পর্কেও দলীল পাওয়া যায় যা ইসলামি রাষ্ট্রের সাথে অন্যান্য রাষ্ট্রের

২১ আল-মায়িদাহ: ০১।

২২ আল-আনফাল: ৫৮।

২৩ আন-নিসা: ১০৭।

২৪ ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, ১/৭৮।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূলনীতি বিষয়ক উপরোক্ত নস বাণী এর সাথে যুক্ত হতে পারে। যেমন:

১. আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ "হে নবী! কোমলতা ও ক্ষমার পথ অবলম্বন করুন এবং সৎ কাজের উপদেশ দিতে থাকুন"।[২৫] কাজি ইবন আতিয়্যাহ র. বলেন, 'ওয়ামুর বিল উরফ' দ্বারা বুঝানো হয়েছে যা মানুষের কাছে অতি পরিচিত এবং যার সাথে শরীয়াহ'র কোনো বিরোধ নেই।[২৬]

আল্লামা শাতিবী র. বলেন, সমাজে প্রচলিত প্রথাসমূহ শরীয়াহ খুব গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে থাকে।[২৭] একই অর্থ গ্রহণ করেছেন আল্লামা সা'দি। তিনি বলেন, আইনি ও লিখিত দলীল নেই শরীয়তের এমন ক্ষেত্রে অধিকার ও শর্তসমূহ নির্ধারণে উরফ বা প্রথা বিরাট একটি উৎস।[২৮]

২. আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনের অন্যত্রে বলেনঃ

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾

"দ্বীনের (পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান) ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের উপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি"।[২৯] যেমন আল্লাহ মানুষকে কষ্টসাধ্য লেনদেনে অনুৎসাহিত করেছেন। ইমাম সারাখসী বলেন, 'সাধারণ রীতি বহির্ভূত লেনদেনে স্পষ্টভাবেই অসুবিধা পরিলক্ষিত হয়'।[৩০] বিভিন্ন অবস্থা ও পরিস্থিতি ভেদে মানুষের প্রচলিত পারস্পরিক সম্পর্কগুলো রাষ্ট্রীয় সম্পর্কগুলোর মতই স্থান পাবে, যতক্ষণ না তা কোনো শারঈ বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হয়। অতএব বলা যায়, বর্তমান সময়ে রাষ্ট্রীয় প্রথার

২৫ আল-আরাফ: ১৯৯।

২৬ ইবনু আতিয়্যাহ, আল-মুহাররির আল-ওয়াযীয, ৬/১৮৬।

২৭ আশ-শাতিবী, আল-মুআফাকাত ফি উসূলিস শরীয়াহ, পর্যালোচনা-আবদুল্লাহ দারাজ, দ্বিতীয় সংস্করণ (মিসর: আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়্যা, ১৩৯৫ হি) ২/২৮৬।

২৮ আস-সা'দী, আল-মুখতারাত আল জালিয়্যা মিনাল মাসায়েল আল-ফিকহিয়্যা, দ্বিতীয় সংস্করণ (রিয়াদ: আররিআসা আল-'আম্মাহ লিল-বুহুসিল ইলমিয়্যা ওয়াল ইফতা ১৪০৫হি.), পৃ. ১২৭

২৯ সূরা হজ্ব, আয়াত ৭৮।

৩০ মুহাম্মদ ইবনে আবি সাহল আস-সারাখসী, আল-মাবসূত (বৈরুত:দারুল মা'রিফা ১৪০৬) ১৩/১৪-১৫ আরো দ্রষ্টব্য একই গ্রন্থের ১/৮৭, ১৫/১২০।

আলাদা মর্যাদা আছে। বরঞ্চ তা ইসলামি রাষ্ট্র কর্তৃক বাস্তবায়ন করা আবশ্যক, যতক্ষণ না তা কোনো শারঈ বিধানের বিরোধিতা না করে। হোক সেটা আন্তর্জাতিক সাধারণ আইনের ক্ষেত্রে অথবা তার কোনো শাখার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আন্তর্জাতিক মানবিক আইনও অনুরূপ যা এই গ্রন্থে আমাদের আলোচ্য বিষয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে 'আন্তর্জাতিক আইন' শীর্ষক গ্রহণযোগ্য রেফারেন্সগুলো উল্লেখ করার পাশাপাশি তা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গভীরভাবে নজর দেয়া উচিৎ। তা হলো নৈতিকতা বজায় রাখা। কারণ, আন্তর্জাতিক ইসলামি রাষ্ট্রীয় সাধারণ আইনের ক্ষেত্রে নৈতিকতার ব্যাপারটা সুস্পষ্ট। ব্যক্তিগত পর্যায়ে আইনি সম্পর্কের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা অনুরূপ। ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে উন্নত নৈতিকতা বজায় রাখা যেমন জরুরী, তেমনি অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে ইসলামি রাষ্ট্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও বিষয়টি লক্ষণীয়। আর যে বিষয়টি কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ইসলামি রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে হালাল ও প্রশংসনীয় তা একই সময় ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে হারাম ও নিন্দনীয় হতে পারেনা। ইসলাম এটা সমর্থন করেনা। আর এটাই ইসলামের সৌন্দর্য। তাছাড়া, ইসলামে মৌলিক রাষ্ট্রীয় মূলনীতিগুলোর একটা হলো, নৈতিকতা বজায় রাখা। সব ক্ষেত্রে বিশেষ করে অন্যান্য রাষ্ট্র ও নিজের নাগরিকদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নৈতিকতা বজায় রাখা একটি ইসলামি রাষ্ট্রের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। সেক্ষেত্রে এই কর্তব্য পালন করতে গিয়ে যদি অনেক মূল্যবান জিনিস ও অনেক স্বার্থ বিসর্জন দিতে হয় তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ, ইসলামি শারীয়ার দৃষ্টিতে নৈতিকতা এমন এক মূল্যবান বিষয় যার কোনো তুলনা হয়না। আর নৈতিকতার পথে যে কোনো ত্যাগ স্বীকার নৈতিকতার তুলনায় সামান্য মাত্র। তাছাড়া নৈতিকতা বহির্ভূত কাজ বরাবরই ঘৃণিত একটি বিষয়।[৩১]

ইসলামের সংস্কার পরিক্রমায় বিশেষ করে মানবাধিকার বিষয়ে যেমন একটি আইনি কাঠামো আছে, তেমনি তার একটি গভীর চারিত্রিক বা নৈতিক কাঠামোও আছে। এই অনুধাবনটি রাসূলের সা. একটি হাদিস থেকে উৎসারিত। তা হলো, "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"

৩১ আবদুল করিম যায়দান, নাজরাতুন ফিশ শারীয়াহ আল ইসলামিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ (বৈরুত: মুআসসাতুর রিসালাহ, ১৪২১ হি.) পৃ. ১৪৫।

"উত্তম চরিত্র পূর্ণ করার জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি"।৩২ চরিত্রের মাহাত্ম্য এত বেশি যে, রিসালাতের মত এত মহান দায়িত্বকে পর্যন্ত চরিত্রের সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে ঈমানের সাথে চরিত্রের একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। হযরত আবু হুরায়রাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সা. বলেছেনঃ "أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً"

"তোমাদের মধ্যে উত্তম চরিত্রবানরাই পরিপূর্ণ মুমিন"।৩৩ তাছাড়া, চরিত্র মানুষের সম্মান বৃদ্ধি করে, এবং তা কিয়ামাতের দিন রাসূল সা. সান্নিধ্য পাওয়ার এক সুবর্ণ মাধ্যম। এ ব্যাপারে রাসূল সা. বলেন:

"إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا"

তোমাদের মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে' প্রিয় ও কিয়ামাতের দিন আমার কাছে সবচেয়ে' কাছের মানুষ হবে তারা, যারা উত্তম চরিত্রবান"।৩৪ সুতরাং উত্তম ও উন্নত চরিত্রের লোকেরাই কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ সা: এর নৈকট্য লাভ করবে। একজন মুসলিমের চরিত্র যত উন্নত হবে সে তত বেশি নৈকট্য পাবে।

অনেক ভালো কাজের উপর "চরিত্র" শ্রেষ্ঠতর হওয়ার কারণে এর মর্যাদা অনেক বেশি। এ ব্যাপারে হযরত আয়িশাহ রা. বলেন, আমি রাসূল সা. কে বলতে শুনেছিঃ

"إنَّ المؤمنَ ليُدرك بحُسن خُلُقه درجة الصائم القائم"

"নিশ্চয়ই মু'মিন ব্যক্তি তার উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে একজন সালাত আদায়কারী ও সিয়াম পালনকারীর ন্যায় মর্যাদা পাবে"।৩৫

সাধারণভাবে রাষ্ট্রীয় আইন এবং বিশেষভাবে মানবিক আইনের ক্ষেত্রে চরিত্রের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, যে কোনো অবস্থায় ন্যায্যতা বজায় রাখা। আল্লাহ বলেন:

৩২ ইমাম মালিক, আল-মুআ'ত্তা, ৭ম সংস্করণ (বৈরুত: দারুন নাফায়িস, ১৪০৪ হি.), হাদিস নং ১৬৩৪, পৃ. ৬৫১।

৩৩ তিরমির্যি, সুনানে তিরমির্যি, আলবানি একে সহীহ বলেছেন, হাদিস নং ৯২৮।

৩৪ তিরমির্যি, সুনানে তিরমির্যি, আলবানি একে সহীহ বলেছেন, হাদিস নং ১৬৪২।

৩৫ আবু দাউদ, সুনানু আবি দাউদ, সুনানু আবি দাউদে আলবানি একে সহীহ বলেছেন, হাদিস নং ৪০১৩।

﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

"বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদের ইনসাফ না করতে প্ররোচনা না দেয়। সুতরাং তোমরা ইনসাফ করো। এটি আল্লাহভীতির সাথে বেশী সামঞ্জস্যশীল। আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাকো। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ সে সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত" ।৩৬

অর্থাৎ, তোমাদের প্রতি কোনো সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ ও শত্রুতা যেন তাদের সাথে অন্যায় করতে বাধ্য না করে। কারণ, নিজের সাথে অন্যায় হওয়ার পরও একজন মুসলিমের উচিত ন্যায়ের পথে চলা। কারো মিথ্যার প্রতিদান মিথ্যা দিয়ে কিংবা বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিদান বিশ্বাসঘাতকতা দিয়ে করা তার জন্য বৈধ নয়।৩৭ এইসব ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত ন্যায়ের অন্যতম একটা মূলনীতি হলো, কোনো একটি কাজের দায়কে তার সম্পাদনকারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা। এবং একজন আরেকজনের কাজের জন্য দায়ী হবে না। আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾

"একজন আরেকজনের বোঝা বহন করবে না" ।৩৮ অর্থাৎ, প্রত্যেকেই তার নিজের ভুলের দায় নিবে।৩৯ আর যুদ্ধ ও সংঘাতের সময় এই মূলনীতিই সবচেয়ে অবহেলিত থাকে। যখন কোনো জাতিকে অন্য জাতির ভুলের দায় দেয়া হয়, তখন তা থেকে যুদ্ধ ও গণহত্যা ও জাতিগত নিধনের সূচনা হয়। আর এর সবগুলোই অন্য জাতির কৃতকর্মের বোঝা হিসেবেই নির্যাতিত জনপদ বহন করে থাকে।

রাসূল সা. ন্যায়ের সাথে বিভিন্ন লেনদেন ও চুক্তি সম্পন্ন করেছিলেন। সেক্ষেত্রে যারা স্বেচ্ছায় দায় নিয়ে চুক্তি ভঙ্গ করেছিলো কিংবা চুক্তি

৩৬ আল-মায়েদাহ: ০৮।

৩৭ আস-সা'দী, তাফসীরুস সা'দী, (জেদ্দা, দারুল মাদানী, ১৪০৮ হি.) ১/৪৫২।

৩৮ আল- ফাতির: ১৮।

৩৯ দ্রষ্টব্য, আল মারাগী, তাফসীরুল মারাগী, দ্বিতীয় সংস্করণ (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-আরাবিয়্যা, ১৯৮৫ খৃ.), ২২/১১৯।

ভঙ্গকারীর সাথে একাত্মতা প্রকাশ করতো, তাদের সাথে রাসূল সা. সেই চুক্তি আর বাড়াতেন না। অন্যদের সাথে চুক্তি অব্যাহত রাখতেন।৪০

মাযহাবের অনেক ইমামও এটার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। ইবনে কুদামাহ তাঁর 'আল-মুগনী' নামক গ্রন্থে বলেছেনঃ "যে চুক্তি ভঙ্গ করেনি সে যদি চুক্তি ভংঙ্গকারীকে স্পষ্ট কোনো কথা ও কাজের মাধ্যমে অপছন্দ করে অথবা চুক্তি থেকে সরে দাঁড়ায় কিংবা খলীফাকে জানায় যে সে চুক্তি ভঙ্গকারীর ব্যাপারটাকে অপছন্দ করে কিন্তু এখনো সে চুক্তিতে অবশিষ্ট আছে, তখন তার বেলায় চুক্তি ভঙ্গ হবে না। আর খলীফা তাকে চুক্তির ব্যাপারে পৃথক হতে আদেশ দিবে যাতে করে চুক্তি ভঙ্গকারী একাই ব্যাপারটির জন্য দায়ী হয়। আর যদি সে পৃথক হতে অস্বীকৃতি জানায় কিংবা চুক্তি ভঙ্গ হওয়াটা মেনে না নেয়, তাহলে সে নিজেই চুক্তি ভঙ্গকারীর কাতারে পড়বে। কারণ সে চুক্তি ভঙ্গ হওয়াটা মেনে নিচ্ছে না। সুতরাং সেও তার মত চুক্তি ভঙ্গকারী হিসেবে পরিগণিত হবে।৪১

এ থেকে বোঝা যায়, ইসলাম ন্যায় ও বিশ্বস্ততার সাথে মূলনীতি মেনে চলায় কতটা আন্তরিক। আন্তর্জাতিক সাধারণ আইনের ক্ষেত্রে ইসলামি মূলনীতিগুলো সুদৃঢ়তা ও সুপ্রতিষ্ঠিত হবার দিক থেকে অন্যান্য মূলনীতিগুলো থেকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র হওয়ায় এর মর্যাদা ও গুরুত্ব অনেক বেশি। কারণ, এগুলো একজন মুসলিমকে আত্মনিয়ন্ত্রণে উদ্বুদ্ধ করে। সে যে কোনো কাজ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি, ভালোবাসা আর সাওয়াব পাওয়ার উদ্দেশ্যে। আর এর মাধ্যমে সে ইহকালিন ও পরকালিন শাস্তি থেকে নিজেকে বাঁচাতে অগ্রসর হয়।

আইন মানার প্রধান কারণ হলো, ইহকালিন শাস্তির ভয়। আইনকে সম্মান করা নয়। এই ব্যাপারে ডক্টর আব্দুল হাই হিজাযী বলেনঃ 'কোনো ব্যক্তি আইনের প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা প্রদর্শন করার পেছনে কোনো ভালো উদ্দেশ্য লালন করেনা। বরং, বাস্তবতা হলো, আইন মানার ক্ষেত্রে ভয়ের পরিমাণ ভালোবাসার চেয়েও বেশি। আইনের ভয় দূর হওয়ার সাথে সাথে তার প্রতি সম্মানও দূর হয়ে যায়'।৪২

---

৪০ দ্রষ্টব্য, ইবনুল কাইয়্যিম, যাদুল মা'আদ ফি হাদয়ি খাইরুল 'ইবাদ, দ্বিতীয় সংস্করণ (বৈরুতঃ মুআসসাতুর রিসালাহ, ১৪০৫হি.), ৩/১৩৬-১৩৭।

৪১ ইবনে কুদামা, আল-মুগনী (রিয়াদঃ মাকতাবাতুর রিয়াদ আল-হাদীসাহ, তা.বি) ৮/৪৬২।

৪২ আবদুল হাই হিজাযী, আল-মাদখাল লি দিরাসাতিল উলূম আল-কানূনিয়্যাহ (কুয়েতঃকুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭২ খৃ.), ১/১০৭-১০৮।

তৃতীয়তঃ ইসলামে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের পরিভাষা

যখন থেকে যুদ্ধের বিপর্যয় ও ভয়াবহতা মানুষকে গ্রাস করা শুরু করে, তখন থেকে যুদ্ধের দুর্যোগ ও যোদ্ধাদের আপদ ও ক্ষতিকে লাঘব করার প্রচেষ্টা চলে আসছে। যাতে করে এই ভয়াবহতা যুদ্ধের গন্ডি পেরিয়ে সাধারণ মানুষকে বিপদে না ফেলে। এটাই হলো আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের চিন্তাধারার মূল ভিত্তি।[৪৩] এই আইনকেই বলা হয়, 'আন্তর্জাতিক মানবিক আইন' যার উদ্দেশ্য হলো সশস্ত্র সংঘাতের সময় মানুষের অধিকার রক্ষা করা, যাতে করে মানবীয় প্রকৃতিকে এই মূলনীতির আলোকে ঢেলে সাজানো যায়।[৪৪] মূলত মানবিক অনুভূতি ও আবেগ থেকেই আন্তর্জাতিক মানবিক আইন উৎসারিত, যা শুধু সংঘাতের বিপদ থেকে মানুষকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যকে লালন করে।

'আন্তর্জাতিক মানবিক আইন' 'আন্তর্জাতিক সাধারণ আইনের' একটি অংশ কিংবা শাখা বিশেষ। দুইটি মিলে আলাদা দুইটি আইনি শাখার প্রতিনিধিত্ব করে। দুইটিরই ক্ষেত্র ও সময়কাল আলাদা। প্রথমটা কার্যকর হয় সশস্ত্র সংঘাতের সময় এবং দ্বিতীয়টা স্থিতিশীল সাধারণ পরিস্থিতিতে। ক্ষেত্র বিশেষে আলাদা হলেও দুইটা একই উদ্দেশ্য লালন করে। আর তা হলো, মানুষকে বিপদমুক্ত করে তাদের অধিকার নিশ্চিত করা।[৪৫]

এই শ্রেনীবিভাগের আলোকে, ইসলামের দৃষ্টিতে 'আন্তর্জাতিক মানবিক আইন' কে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় যে, এটি হলো এমন কিছু শারঈ মূলনীতির সমষ্টি যার উদ্দেশ্য হলো, সশস্ত্র সংঘাতে মানুষকে বিপদমুক্ত রেখে তাদের অধিকার নিশ্চিত করা। ইসলামের দৃষ্টিতে যুদ্ধ এমন একটি প্রয়োজনীয়তা যার চাহিদা পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথেই এর কার্যকারিতা শেষ হয়ে যায়। এই ব্যাপারটিও ইসলামে

৪৩ শরীফ আতলাম, সম্পাদক, আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের মূলনীতি বিষয়ক জন পিকটেট এর লেকচারসমুহ, তৃতীয় সংস্করণ (বৈরুত: দারুল মুসতাকবাল আল-আরাবী, ২০০৩ খৃ.), পৃ. ৫২।

৪৪ আবদুল গনি আবদুল হামিদ মাহমুদ, হিমায়াতু দাহায়া আন-নাযআ'ত আল মুছাল্লাহা ফিল কানুনিদ দুআলি আল ইনসানী ওয়াশ শরীয়াহ আল ইসলামিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ (কায়রো: আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি, ২০০০) পৃ. ৬।

৪৫ আবুল খাইর আহমদ আতিয়্যা, হিমায়াতুস সুক্কান আল-মাদানিয়্যীন ওয়াল আ'ইয়ান আল মাদানিয়্যা ইব্বানান নাযআতিল মুছাল্লাহা: দিরাসাতুন মুকারানাতুন বিশ শরীয়াতিল ইসলামিয়্যা, ১ম সংস্করণ (কায়রো: দারুন নাহদা, ১৯৯৮) পৃ. ১৭।

'আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করে আমরা দুইটা বিষয়ের অবতারণা করতে পারি। এক, যুদ্ধ স্রেফ প্রয়োজনীয়তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। দুই, যুদ্ধে যা কিছু সংঘটিত হবে সবই মানবীয় সম্মান বজায় রেখে হবে। এই দু'টো হলো ইসলামিক মূলনীতি। প্রথমটা হলো 'প্রয়োজনীয়তার নীতি'। ইসলামি শারীয়াহ'র একটি মূলনীতি হলো, 'প্রয়োজনের মূল্যায়ন হবে তার চাহিদা পর্যন্ত এইক্ষেত্রে যুদ্ধ একটি প্রয়োজন।[৪৬] সুতরাং যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তার সীমার বাইরে গিয়ে কোনো অবস্থাতেই কিছু করা যাবেনা। এটা হবে সীমালঙ্ঘন যা অন্য পক্ষের উপর অন্যায় ও বাড়াবাড়ি।

আর দ্বিতীয়টা হলো, 'মানবিক মূলনীতি'। যার মূল বিষয় হচ্ছে মানুষকে সম্মান করা। আল্লাহ বলেনঃ ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ "আমি বনি আদমকে সম্মানিত করেছি"।[৪৭] আর আল্লাহ মানুষের প্রতি অত্যাচারকে হারাম করেছেন। তিনি বলেনঃ ﴿وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا﴾ "তোমাদের মধ্যে যারা যুলম করবে, তাদেরকে আমি বড় শাস্তি আস্বাদন করাবো"।[৪৮] এই শাস্তি প্রত্যেক অত্যাচারিকে অন্তর্ভুক্ত করে।[৪৯] সুতরাং যুদ্ধক্ষেত্রে যুলমও এর অন্তর্ভুক্ত। এই মূলনীতির আলোকে ইসলাম মানুষকে যুদ্ধ করতে বলে মানবিক চেতনা নিয়ে।[৫০] সুতরাং কোনো মুসলিম শারঈ কারণ ছাড়া যুদ্ধ করতে অগ্রসর হবে না। আল্লাহ বলেন:

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

"আল্লাহ যে প্রাণ হত্যা করা হারাম করেছেন তা ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া হত্যা করো না, এই সম্পর্কে আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পারো"।[৫১] যদি শারঈ কারণ পাওয়া যায় তখন সর্বোত্তম মানবিক পন্থায় যুদ্ধ করতে হবে। যেমনটি শাদ্দাদ বিন আওসের হাদিসে বর্ণিত

---

৪৬ দ্রষ্টব্য, যারকাশী (বদরুদ্দিন মুহাম্মদ ইবন বাহাদের আশ-শাফিঈ), আল-মানসুর ফিল কাওয়ায়িদ, সম্পাদনা, ফায়িক আহমেদ মাহমুদ, প্রথম সংস্করণ (কুয়েত: ওয়াকফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১৪০২ হি.) ২/৩২০।

৪৭ আল-ইসরা: ৭০।

৪৮ আল-ফুরকান: ১৯।

৪৯ দ্রষ্টব্য, শাওকানী, ফাতহুল কাদীর ৪/৯১।

৫০ দ্রষ্টব্য, ইহসান আল-হিন্দি, আল-ইসলাম ওয়াল কানুন আদ-দুয়ালী, প্রথম সংস্করণ (দামেস্ক: দারু তালাস লিদ দিরাসাতি ওয়াত তারজমা ওয়ান নাশর, ১৯৮৯ খৃ.) পৃ. ১৩৭।

৫১ আল-আনআ'ম: ১৫১।

হয়েছে, রাসূল সা. বলেছেনঃ "আল্লাহ প্রতিটি ক্ষেত্রে সুসম্পাদনাকে আবশ্যক করেছেন। সুতরাং তোমরা হত্যা করলে তা উত্তম রূপে করো। আর কিছু জবাই করলে উত্তম পন্থায় জবাই করো"।[৫২]

রাসূল সা. খুব সংক্ষেপে যুদ্ধ ও এই দুইটি মূলনীতির মাঝে সমন্বয় করেছেন। তিনি বলেন: "আমি দয়ার নবী, আমি যুদ্ধের নবী"।[৫৩] তিনি এই হাদিসে মালহামা[৫৪] (যুদ্ধ) ও দয়ার মাঝে সমন্বয় করেছেন। আর দয়াকে যুদ্ধের আগে উল্লেখ করেছেন যাতে একজন মুসলিম যোদ্ধা অনুধাবন করে যে, সে ন্যায়ের প্রতীক, স্রেফ একটা তলোয়ার নয়।[৫৫] প্রয়োজনে সে যুদ্ধে অবতীর্ন হলেও কখনো দয়া ও নৈতিকতা বিস্মৃত হয় না।

আন্তর্জাতিক সাধারণ আইনের ক্ষেত্রে ইসলাম নৈতিকতার প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করেছে, যেমনটা আমরা বর্ণনা করেছি। কিন্তু এমন কিছু ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি আছে যেখানে একজন ব্যক্তিকে এমন কিছু আকস্মিক কারণে নিজেকে দ্বিগুণ নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, যার ফলে সে তার নৈতিকতা ও মূল্যবোধ ভুলে বসে। যেমন যুদ্ধের সময় অনেক যোদ্ধা তার কর্মকান্ড ও আচরণের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এইসব ক্ষেত্রে ইসলামের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি আছে।

এইসব ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রগুলোতে মন্দের উপর আধিপত্য বিস্তারের আহবান জানিয়ে ইসলাম চরিত্র ও মূল্যবোধকে জোরালোভাবে গুরুত্ব দিয়েছে। এই ব্যাপারে অনেক শারঈ বাণী পাওয়া যায়। তার কিছু নমুনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

---

৫২ তিরমিযী, সুনানে তিরমিযী, সম্পাদনা- আহমদ মুহাম্মদ শাকির ও অন্যান্য (বৈরুত:দারু ইহয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, তা.বি) ৪/২৩।

৫৩ হাদিসটি ইবনে সা'দ উদ্ধৃত করেছেন, আত-তাবাকাতুল কুবরা (বৈরুত: দারু সাদের, তা.বি), ১/১০৫ (আবু হুসাইন মুজাহিদ সূত্রে) এবং মুহাম্মদ ইবন হিব্বান, সহীহ ইবনু হিব্বান, সম্পাদনা: শোআইব আরনাউত, দ্বিতীয় সংস্করণ (বৈরুত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪১৪ হি) ১৪/২২০, হাদিস নং ৬৩১৪, ইবনু জারীর আল-তাবারী, তাফসীর আল্-তাবারী, সম্পাদনা: আবদুল্লাহ আল তুর্কী, প্রথম সংস্করণ (কায়রো: দারুল হিজর, ১৪২২ হি.) ১৪/১০৭।

৫৪ আল মালহামা হলো একাধিক যুদ্ধের সম্মীলনে একটি দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ। দ্রষ্টব্য, ইবনুল আছীর, আন-নিহায়াতু ফি গারীবিল হাদিস ওয়াল আছার, সম্পাদনা: তাহির আহমদ ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ (মক্কা: দারুল বায,তা.বি.) ৪/২৩৯-২৪০।

৫৫ আবুল খাইর আতিয়্যাহ, হিমায়াতুস সুক্কান আল মাদানিয়্যিন ওয়াল আ'ইয়ান আল-মাদানিয়্যাহ, পৃ. ১৬।

"যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় আল্লাহর পথে ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল তাদের জন্য আল্লাহ জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন। আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন"।[৫৬] এখানে আল্লাহ তাদের প্রশংসা করেছেন যারা তাদের রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

২. আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ،وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾

"ভালো আর মন্দ সমান নয়। উৎকৃষ্ট দিয়ে মন্দকে দূর করো। তখন দেখবে, তোমার আর যার মধ্যে শত্রুতা আছে সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। এই গুণ তারাই লাভ করে যারা ধৈর্যশীল ও মহা ভাগ্যবান"।[৫৭] এই আয়াতদ্বয় শত্রুর সাথে ভালো আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। যার মাহাত্ম্য কেবল তারাই পায় যারা ধৈর্যশীল ও মহা ভাগ্যবান।

৩. আবু হুরায়রাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ

"ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب"

ধরাশয়ী করে শক্তিশালী হওয়া যায়না। প্রকৃত শক্তিশালী সেই ব্যক্তি যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে"।[৫৮] স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারা ব্যতিক্রম নয়। বরং রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারা ব্যতিক্রম বিষয়।

৪. রাসুল সা. বলেছেনঃ

"مَنْ كَظَمَ غَيظاً، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أنْ يُنْفِذَهُ، دَعَاهُ اللهُ سُبحَانَهُ وَتَعَالى عَلَى رُؤُوسِ الخَلائِقِ يَومَ القِيامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنَ الحُورِ العِينِ مَا شَاءَ"

৫৬ আলে ইমরান: ১৩৪।

৫৭ হা-মীম সাজদাহ: ৩৪-৩৫।

৫৮ মুত্তাফাকুন আলাইহে, ইমাম বুখারী, সহীহ বুখারী ৫/২২৬৭। ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম ৪/২০১৪।

"যে ব্যক্তি রাগ প্রকাশ করার সামর্থ্য থাকার পরও রাগ সংবরণ করে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাকে সবার আগে ডাকবে আর ইচ্ছামত হুর নির্বাচনের সুযোগ দিবেন"।[৫৯]

এই সকল অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ইসলাম নৈতিকতা বজায় রাখতে উৎসাহ দেয়। আর এক্ষেত্রে অশোভনীয় আচরণে বাধা দেয়। ইসলাম নৈতিকতাকে অনেক গুরুত্ব দিয়েছে এবং চরিত্রবানদের জন্য ইহকালিন ও পরকালিন প্রতিদানের ঘোষণা দিয়েছে যা নেতা ও সাধারণ মানুষের আচার-আচরণে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে। এ থেকে বোঝা যায়, মানুষের মাঝে চরিত্রের পাল্লা যত ভারি হয় বিধিবদ্ধ আইনের প্রতি মানুষের প্রয়োজনীয়তা তত কমে যায়। বিপরীতে মানুষের চারিত্রিক দিকটা যখন দুর্বল হয়ে যায়, তখন তারা বিকল্প রক্ষাকবচ হিসেবে আইনের আশ্রয় নেয় যার মধ্যে তারা স্থিতিশীলতা খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু এই আইনগুলো খুব দ্রুত পরিবর্তিত ও বিকৃত হতে থাকে। যখন নাস্তিক সমাজব্যবস্থা সরাসরি আল্লাহকে অস্বীকার করে মানবসৃষ্ট চরিত্রের প্রতি ঝুঁকে পড়ে তখন তারা কিছু আইন প্রণয়ন করে এবং প্রয়োগ করতে অগ্রসর হয়। কিন্তু সে আইনগুলো উল্লেখযোগ্য কিছুই বয়ে আনতে পারেনি, যেমনটা চারিত্রিক প্রশিক্ষণ পুরো মানবতাকে অধঃপতন থেকে রক্ষা করতে পেরেছে।

চরিত্রের প্রতি ইসলামের এই গুরুত্বারোপের মাধ্যমে এটা প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম তার অধিকাংশ বিষয়ে সাধারণ কিছু মূলনীতি নির্ভর যা সুদৃঢ় হয় চারিত্রিক দৃঢ়তার মাধ্যমে। কারণ, চরিত্র যে কোনো ভালো কাজ ও সংস্কারের উত্তম মাধ্যম। সমাজে প্রতিষ্ঠিত নৈতিকতা মানুষের মর্যাদা এবং যুদ্ধ ও শান্তি সর্বাবস্থায় তাদের অধিকার নিশ্চিত করে, আর এতে সকলে একটি নিরাপদ ও স্থিতিশীল জীবন যাপন করে।

মোদ্দাকথা, ইসলাম স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে (স্থিতিশীল অবস্থায়) চরিত্রের অবস্থানকে সমুন্নত রেখেছে। কিন্তু অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে (যুদ্ধের সময়) এই গুরুত্বকে দ্বিগুণ করেছে। এটা কেবল মানুষের অধিকার রক্ষার্থে। এর মাধ্যমে এটাও সাব্যস্ত হলো যে, প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলাম চরিত্রের উন্নতি সাধনের কথা বলে। যখনই অন্তর অধঃপতনের শিকার

[৫৯] আবু দাউদ, সুনানে আবি দাউদ ৪/২৪৮।

হয় তখনই ইসলাম মূল্যবোধ ও নৈতিকতার কথা বলে। এইসব এজন্যই করা হয়েছে যেন সে মানব প্রজন্মের প্রতি সম্মানবোধ অব্যাহত রাখে এবং রাগ কিংবা স্বস্তি, শত্রু কিংবা মিত্র সকলের ক্ষেত্রে নিজের সত্ত্বাকে গঠন করতে পারে।

এটাই সেই সাধারণ মূলনীতি যেটাকে ইসলাম প্রতিটি অন্তরে গ্রোথিত করার চেষ্টা করেছে। যাতে করে মানুষকে আশংকাজনক অবস্থায় বিপদমুক্ত রাখা যায়। বিশেষ করে যুদ্ধের সময়, যেখানে সবসময় অন্যায় ও শত্রুতা লেগে থাকে। উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে ইসলামের দৃষ্টিতে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের একটি সাধারণ ধারণা পাওয়া গেলো। যার মূল কথা হলো, সর্বাবস্থায় চরিত্রের সুদৃঢ় প্রতিফলন ঘটানো এবং এক্ষেত্রে মানবীয় মূল্যবোধ অনুসরনের কঠোর অনুশীলন করা।

প্রথম অধ্যায়

ইসলামে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রসমূহ

ইসলামে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রসমূহ:

ইসলাম শান্তির ধর্ম। আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ﴾

"হে মুমিনগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো" ।৬০ ইসলাম শুরু থেকেই যুদ্ধ সংঘটিত না হওয়ার সব কৌশল অবলম্বন করে যায়। কিন্তু যখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে যায়, তখন ইসলাম কিছু মূলনীতি বাতলে দেয় যার মাধ্যমে যোদ্ধারা সুরক্ষিত থাকে এবং যুদ্ধ সংক্রান্ত সব ধরনের ক্ষয়ক্ষতি থেকে বেসামরিক লোকজন এবং যুদ্ধে যাদের অংশগ্রহণ ছিলো না তারা সুরক্ষিত থাকতে পারে। তাছাড়া যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারেও ইসলাম কিছু মূলনীতি বাতলে দেয় যাতে করে তারাও সুরক্ষিত থাকে।

এই মূলনীতিগুলোর উপর আলোকপাত করার আগে আমরা কিছু অধিকার নিয়ে কথা বলবো, যুদ্ধ ও সশস্ত্র সংঘাতে আক্রান্তদের রক্ষা করতে ইসলাম যেগুলোর স্বীকৃতি দিয়েছে। এগুলোর বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হলোঃ

এক: আহত ও বিপদগ্রস্তদের অধিকারসমূহ সংরক্ষণ

শত্রুদের মধ্য থেকে আহত ও আক্রান্তদের প্রতি কোনো ধরনের ক্ষতি ও কষ্ট সাধন হতে বিরত থাকতে হবে, যারা অস্ত্র বহন করতে ও মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে অক্ষম। বরং তাদের সাথে মানবিক আচরণ করে তাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এটা হলো ইসলামের একটি মৌলিক মূলনীতির প্রয়োগ।

৬০ আল-বাকারাহ: ১৩৪।

সেটা হলো, যুদ্ধ একটি প্রয়োজনীয়তা। আর 'প্রয়োজনীয়তার প্রয়োগ হবে তার চাহিদা পর্যন্ত'। যদি চাহিদা পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে আর সামনে এগুনো যাবে না। তদ্রুপ যদি কোনো সৈনিক যুদ্ধ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে তাহলে তার সাথে এবং তার অনুরূপ অন্যের সাথে যুদ্ধ করা যাবে না। আর আহতদেরও শাস্তি দেওয়া যাবে না। কারণ, সেটা কোনোমতেই যুদ্ধের নৈতিকতার মধ্যে পড়ে না। যদি আহত ব্যাক্তি প্রতিরোধ গড়ে তুলতে অক্ষম হয় তখন মানবিকতার স্বার্থে তার সাথে যুদ্ধবন্দীর মত আচরণ করতে হবে। তাছাড়া যুদ্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো শত্রুর শক্তিকে দুর্বল করে দেওয়া। এর অতিরিক্ত কিছু করলে তা হবে অন্যায়।৬১ আবু উবাইদুল কাসিম ইবন সলাম তাঁর "আল-আমওয়াল" নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেনঃ "মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল সা. বিজয়ের ঘোষককে এ বিষয়ে ঘোষণা করার আদেশ দেন, যেনো কেউ আহত ব্যক্তিকে আঘাত না করে, কোনো পলায়নরত ব্যক্তিকে তাড়া না করে, কোনো বন্দীকে হত্যা না করে এবং যে ঘরের দরজা বন্ধ করে অবস্থান করবে সে নিরাপদ থাকবে"।৬২ ওহাবা আয-যুহাইলী র. বলেন: "এটা শুধু মক্কাবাসীদের জন্য সীমাবদ্ধ নয়। কারণ শব্দটি এখানে ব্যাপক অর্থ বহন করে। ফলে শব্দটির প্রয়োগ তার ব্যপকতার উপরেই বিদ্যমান থাকবে"।৬৩

যদি মুসলিমগণ বিজয় ও সাহায্যের ব্যাপারে নিশ্চয়তা ও প্রশান্তি লাভ করে, তখন তারা শত্রুপক্ষের আহতদের সাথে সদাচরণ করবে। কারণ, ইসলাম পুরো বিশ্ববাসীর জন্য অবাধ রহমতের ধর্ম। আর আহত ও অসুস্থ অবস্থার দাবী হলো দয়াদ্রপূর্ণ আচরন। আহত ব্যক্তির একটি অধিকার হলো, তার সম্পূর্ণ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। কারণ তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করাকেও তাদের সাথে ভালো আচরণ করার অন্তর্ভূক্ত।৬৪ ইমাম তাবারানী র. বর্ণনা করেন, রাসূল সা. বলেছেনঃ " اسْتَوْصُوا بِالأُسَارَى خَيْرًا "

"তোমরা যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে কল্যাণকামী হও"।৬৫

---

৬১ দ্রষ্টব্য, মুহাম্মদ আবু যাহরাহ, নাযরিয়্যাতুল হারবি ফিল ইসলাম (মিসর: ওয়াকফ ও ইসলামি কার্যক্রম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উচ্চতর পরিষদ, ১৩৮০ হি.) পৃ. ৬১।

৬২ আবু উবাইদুল কাসেম ইবন সালাম, আল-আমওয়াল, সম্পাদনা: মুহাম্মদ খলীল হারাছ (কায়রো: মাকতাবাতুল কুল্লিয়্যাত আল-আযহারিয়্যা, ১৩৯৬ হি.), পৃ. ১৪১।

৬৩ ওহাবা আয যুহাইলী, আছারুল হারবি ফিল ফিকহিল ইসলামি, পৃ. ৪৭৭।

৬৪ দ্রষ্টব্য: ওহাবা আয যুহাইলী, আছারুল হারবি ফিল ফিকহিল ইসলামি, পৃ. ৪৭৬।

৬৫ হাদিসটি ইমাম তাবারানী মু'জামুস সগীর ও মু'জামুল কাবীরে উদ্ধৃত করেছেন। দ্রষ্টব্য, সুলায়মান আত-তাবারানী, আল-মু'জামুস সগীর, সম্পাদনা: মুহাম্মদ মাহমুদ আল-হাজ্জ আমরীর, প্রথম সংস্করণ (বৈরুত:

আহত ব্যক্তিকে চিকিৎসা বিহীন অবস্থায় রাখা কোনোমতেই ইহসানের পর্যায়ে পড়ে না। বরং তা অন্যকে কষ্ট দেওয়ার অন্তর্ভুক্ত, যার ব্যাপারে সরাসরি নিষেধাজ্ঞা এসেছে। যেমনটি আল্লাহ বলেনঃ

﴿ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾

"তোমরা সীমালঙ্গন করোনা, নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্গনকারীকে পছন্দ করেন না" ।৬৬ হাদিসে এসেছে, হিশাম ইবন হাকীম ইবন হিযাম রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূল সা. কে বলতে শুনেছি,

"إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا"

"আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন যারা মানুষকে দুনিয়াতে কষ্ট দেয়" ।৬৭ তাছাড়া শাস্তি দেওয়া এমন একটি কাজ যা নৈতিকতা ও মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক, যে নৈতিকতার বীজকে ইসলাম অন্তরে বপন করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

দুই: যুদ্ধবন্দীদের অধিকার

এখানে যুদ্ধবন্দী বলতে বুঝায় এমন সব শত্রুদেরকে যারা ইসলামের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য শত্রুতা পোষন করে তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশ নেয় অতঃপর মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। যুদ্ধবন্দীদের সাথে পূর্ববর্তী যুগের মুসলিমগণ যে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করেছেন ইতিহাসে তার সমকক্ষ দৃষ্টান্ত আর খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁরা এক্ষেত্রে নিজ ধর্মের নির্দেশনাকে যথাযথ ভাবে অনুসরণ করেছেন। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেন:

﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ﴾

আল-মাকতাবাতুল ইসলামি, ১৪০৫ হি.), ১/২৫০। সুলায়মান আত-তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর, সম্পাদনা: হামদি ইবন আবদুল মাজীদ আস-সালাফী, দ্বিতীয় সংস্করণ (মুসেল: মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, ১৪০৪ হি.), ২২/৩৯৩। এ সম্পর্কে হায়সামী বলেন, এর সনদ হাসান, আলী আল-হায়সামী, মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ (বৈরুত: দারুল কিতাব আল-আরবি, ১৪০৮ হি.) ৬/৮৬।

৬৬ আল্-বাকারাহ: ১৯০।

৬৭ ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, সম্পাদনা: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, (কায়রো: দারুল ইহয়ায়িল কুতুবিল আরাবিয়্যা) ৪/২০১৭, হাদিস নং. ২৬১৩ এবং মুহাম্মদ ইবন হিব্বান, সহীহ ইবন হিব্বান, সম্পাদনা: শোয়া'ইব আল-আরনাউত, দ্বিতীয় সংস্করণ (বৈরুত: মুআসসাতুর রিসালাহ, ১৪১৪ হি.) ১২/৪২৯।

"আর আল্লাহর মোহাব্বতে মিসকীন, ইয়াতীম, এবং বন্দীকে খাবার দান করে এবং (তাদেরকে বলে) আমরা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই তোমাদের খেতে দিচ্ছি। আমরা তোমাদের কাছে এর কোন প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা পেতে চাই না।"[৬৮]

ইসলাম বন্দীদের বিষয়টিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছে। তাদের মযার্দা সংরক্ষণ করেছে, তাদের প্রাপ্য অধিকারগুলোকে সমুন্নত রেখেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে যেকোনো প্রকার বিদ্বেষ প্রদর্শন নিষেধ করেছে। নিম্নে আমি বন্দীদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে ইসলামের বক্তব্যগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

১. মহান আল্লাহ তায়ালা সূরা আআনফালে বলেন:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

"হে নবী! তোমাদের হাতে যেসব বন্দী আছে তাদেরকে বলো, যদি আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালো কিছু দেখেন, তাহলে তিনি তোমাদের থেকে যা নেয়া হয়েছে তা থেকে অনেক বেশী দেবেন এবং তোমাদের ভুলগুলো মাফ করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"[৬৯]

যুদ্ধবন্দীদের মধ্য থেকে যাদের অন্তরে ভালো কিছু রয়েছে মহান আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এমতাবস্থায় তাদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব ন্যূনতম দয়া মানবতা দেখানো ছাড়া অন্য কিছু করার অধিকার মুসলমানদের থাকে না।

২. অনুরূপভাবে ইসলাম বন্দীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা আবশ্যক করেছে এবং তাদের মানবিক মর্যাদাকে অসম্মান করতে নিষেধ করেছে। তাবারানী আবূ আযীয থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন, তাতে রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: "তোমরা যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে কল্যাণকামী হও"।[৭০]

---

৬৮ আদ-দাহর/আল-ইনসান: ৮-৯।

৬৯ আল-আনফাল: ৭০।

৭০ হাদিসটি ইমাম তাবারানী মু'জামুস সগীর ও মু'জামুল কাবীরে উদ্ধৃত করেছেন। দ্রষ্টব্য, সুলায়মান আত-তাবারানী, আল-মু'জামুস সগীর, সম্পাদনা: মুহাম্মদ মাহমুদ আল-হাজ্জ আমরীর, ১ম সংস্করণ (বৈরুত: আল-মাকতাবাতুল ইসলামি, ১৪০৫ হি.), ১/২৫০। সুলায়মান আত-তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর, সম্পাদনা:

আহযাব যুদ্ধে কঠিন এক পরিস্থিতিতে বনু কুরাইযার ইহুদীরা রাসূলুল্লাহ সা. ও তাদের মধ্যকার চুক্তি ভঙ্গ করে মুসলমানদের জীবনকে সংকটের মুখে ফেলে দেয়। তাদের সাথে মুসলমানদের চুক্তি ছিল, মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিকদেরকে তারা কোনো প্রকার সহযোগিতা করবে না। তারা যখন রাসূল সা. এর সাথে খেয়ানত করে এই চুক্তি ভঙ্গ করলো তখন তিনি তাদেরকে অবরোধ করলেন। ফলে তারা পরাজিত হয়ে মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়ে গেল। তখন নবী সা. তাঁর সাহাবীদেরকে বললেন:

"أحسنوا أساركم وقيلوهم واسقوهم حتى يبردوا"

"তোমরা বন্দীদের সাথে উত্তম আচরণ করো, তাদেরকে বিশ্রাম নিতে দাও এবং তারা ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত পান করাও।"[৭১]

ইমাম মালিক রা. কে প্রশ্ন করা হলো, শত্রুদের গোপন তথ্য বের করার জন্য বন্দীদেরকে নির্যাতন (রিমান্ড) করা যাবে কি না? উত্তরে তিনি বললেন, আমি এরূপ শুনিনি।[৭২] এটি তার অভিমত। এ বিষয়ে অন্য মতও রয়েছে:

৩. ইসলাম তার সহজজাত উদারতার ফলে মহান আল্লাহ তাআ'লার নির্দেশে সাড়া দিয়ে বন্দীদের খাবারের ব্যাপারে যত্নশীল হওয়াকে আবশ্যক করেছে। বন্দীদের খাওয়ানোকে আল্লাহ পাক সৎকর্মশীল ও সর্বোত্তম মানের মুমিনদের গুণ হিসেবে গণ্য করেছেন। তাদের অবস্থা বর্ণনা করে আল্লাহ তাআ'লা বলেন:

﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾

হামদী ইবন আবদুল মাজিদ আস-সালাফী, দ্বিতীয় সংস্করণ (মূসেল: মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, ১৪০৪ হি.), ২২/৩৯৩। এ সম্পর্কে হাইসামী বলেন, এর সনদ হাসান, আলী আল-হাইসামী, মুজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ (বৈরুত: দারুল কিতাব আল-আরবি, ১৪০৮ হি.) ৬/৮৬।

৭১ মুহাম্মদ ইবন হাসান আশ-শাইবানী, আস-সিয়ার আল-কাবীর ওয়া শারহুহু লিস-সারাখসী, সম্পাদনা: মুহাম্মদ হাসান মুহাম্মদ আশ-শাফিঈ, প্রথম সংস্করণ (বৈরুত:দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৭হি.)। মুহাম্মদ ইবন ইউসফ আস-সালিহী, সুবুলুল হাদয়ি ওয়ার রাশাদ ফি সীরাতি খায়রিল ইবাদ, সম্পাদনা: ফাহীম মুহাম্মদ শালতুত ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ (কায়রো: আল-মাজলিসুল আ'লা লিশ-শুউন আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৪১৩ হি.)। এখানে উল্লেখিত কাইয়্যিলূহুম শব্দটি 'কাইলুলা' শব্দ হতে উদ্ভূত হয়েছে, যার অর্থ: দিনের মধ্যভাগে একটু বিশ্রাম করা ও ঘুমানো। অর্থাৎ কাইলুলার সময় তাদেরকে একটু বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ দাও।

৭২ ওহাবা আয যহাইলী, আছারুল হারবি ফিল ফিকহিল ইসলামি, পৃ. ৪১৫।

"আর আল্লাহর মোহাব্বতে মিসকীন,ইয়াতীম, এবং বন্দীকে খাবার দান করে" ।৭৩ অর্থাৎ তারা মারাত্মক ক্ষুধার্ত থাকা অবস্থায়ও নিজেদের নিকট পছন্দের ও উত্তম খাবারগুলো দূর্বল, মিসকিন, ইয়াতিম ও বন্দীদের মাঝে আগে বিতরণ করে। বিষয়টি শুধু খাওয়ানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়: বরং তাদের সাথে সামগ্রিক দিক থেকে উত্তম আচরণ নিশ্চিত করাই মূল উদ্দেশ্য। খাবারকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র, উদ্দেশ্য সকল প্রকার উপকার ও সদাচার।৭৪ আর খাবারের উল্লেখ করার কারণ হলো, উত্তম আচরণ সমূহের মধ্যে এটিই অগ্রগণ্য এবং অপরকে যথার্থ অগ্রাধিকারের প্রমাণ। তা ছাড়া অতি উচ্চমানের চরিত্র ও মূল্যবোধ না থাকলে কোনো ব্যক্তি খুব ক্ষুধার্ত অবস্থায় নিজের খাবারে অন্যকে কখনোই অগ্রাধিকার দিতে পারে না। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সা. এর সাহাবীগণের জীবনের দিকে লক্ষ্য করলে অহরহ দেখা যাবে, তাঁরা নিজেরা যা খেয়েছেন তাঁদের বন্দীদেরকে তার চেয়েও উত্তম খাবার খেতে দিয়েছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আবু আজীজ ইবন উমাইর নামক একজন যুদ্ধবন্দীর বক্তব্য উল্লেখ করা যাক। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধ শেষে ফেরার পথে আমি আনসারদের একটি গ্রুপের সাথে ছিলাম। দুপুরে কিংবা রাতের খাবারের সময় তাঁরা আমাকে রুটি খেতে দিয়ে নিজেরা শুধু খেজুর খেতেন। কারণ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সা. তাঁদেরকে আমাদের ব্যাপারে উপদেশ দিয়ে গেছেন। অবস্থা এমন ছিল যে, তাঁদের কারো হাতে সামান্য এক টুকরো রুটি থাকলেই তা আমাকে দিয়ে দিতেন। এতে আমি লজ্জিত হয়ে তা ফিরিয়ে দিতাম। তিনি তা গ্রহণ না করে পুনরায় আমার দিকে ফিরিয়ে দিতেন।

আবু ইউসুফ র. বলেন, "চূড়ান্ত বিচারের আগ পর্যন্ত মুশরিক বন্দীদের প্রত্যেককে অবশ্যই খাবার দিতে হবে এবং তাদের সাথে উত্তম আচরণ করতে হবে" ।৭৫ আর তাদেরকে খাবার ও যথাযথ পরিধেয় বস্ত্র না দিয়ে ফেলে রাখা কোন উত্তম আচরণ হতে পারে না।

---

৭৩ সূরা আদ-দাহর/ইনসান, আয়াত ৮।

৭৪ দ্রষ্টব্য, আল মারাগী, তাফসীরুল মারাগী, দ্বিতীয় সংস্করণ (বৈরুত: দারু ইহয়াইত্ তুরাসিল আরবি, ১৯৮৫ খৃ.) ২৯/১৬৫।

৭৫ আবু ইউসুপ ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম, আল-খারাজ, ষষ্ঠ সংস্করণ, (কায়রো: আল-মাতবা'আহ আস-সালাফিয়্যাহ), পৃ. ১৬১।

পূর্ববর্তী মুসলিম সেনানায়কগণ বিভিন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় এই মূলনীতিকে যথার্থভাবে অনুসরণ করেছিলেন। তাঁরা বন্দীদেরকে সম্মান করতেন, তাদেরকে ক্ষুধার্ত রাখতেন না। ইতিহাসে মুসলিম সেনাপতি সালাহুদ্দিন আইয়ূবীর এরূপ একটি ভূমিকার কথা উল্লেখ রয়েছে। ক্রুসেডারদের সাথে যুদ্ধ করার সময় তিনি একবার বিপুল সংখ্যক ইউরোপীয় সৈন্যকে বন্দী করেন, যাদেরকে খাওয়ানোর মতো পর্যাপ্ত পরিমান খাবার মুসলিমদের হাতে মজুদ ছিলো না। ফলে তাদের সকলকে তিনি মুক্ত করে দেন। মুক্তির পর তারা পুনরায় একত্র হয়ে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হলে তিনি একে স্বাগত জানিয়ে মত দেন, এদেরকে বন্দী করে ক্ষুধার্ত অবস্থায় মেরে ফেলার চাইতে যুদ্ধরত অবস্থায় রণক্ষেত্রে হত্যা করাই শ্রেয়।[৭৬]

৪. যুদ্ধবন্দীর সাথে কাঙ্ক্ষিত উত্তম আচরণের আরেকটি দিক হলো, তাদেরকে উত্তম পোশাক প্রদান করা, যাতে তারা গরমের উত্তাপ ও শীতের ঠান্ডা থেকে বাঁচতে পারে। হযরত জাবির রা. এর হাদীসের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণিত আছে, বদর যুদ্ধের দিন আব্বাস ও অন্যান্য বন্দীদের তাঁর কাছে নিয়ে আসা হলে তিনি দেখলেন একজন বন্দীর গায়ে কোন জামা-কাপড় নেই। রাসূলুল্লাহ সা. তার দিকে তাকালেন এবং তার গায়ে লাগার মতো আবদুল্লাহ ইবন উবাই এর জামা পেলেন এবং তাকে তা পরিয়ে দেন।[৭৭] অনুরূপ বর্ণিত আছে যে, তিনি কিছু বন্দীকে নিজের জামাও পরিয়ে দিয়েছেন।

৫. বন্দীদের সাথে ইসলামের আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ আচরণ হলো, তাদেরকে বন্দী অবস্থায়ও নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার দেওয়া।[৭৮] ইসলাম তাদেরকে এই অধিকারটি দিয়েছে। এ থেকে সহজেই বুঝা যায় তাদের ধর্মীয় কাজে হস্তক্ষেপ কিংবা তাদেরকে জোরপূর্বক ইসলমে দীক্ষিত করার প্রচেষ্টা ইসলাম কখনোই সমর্থন করে না। মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾

---

৭৬ দ্রষ্টব্য, মুহাম্মদ আবু যাহরাহ, নাযারিয়্যাতুল হারবি ফিল ইসলাম, পৃ. ৫৬-৫৭।

৭৭ বুখারী, সহীহ আল-বুখারী (রিয়াদ: তাওযীউর রিয়াসাহ আল-'আম্মাহ লিল ইফতা ওয়াল বুহূস আল-ইলমিয়্যাহ, রিয়াদ), জিহাদ অধ্যায়, বাব: বন্দীদের পোশাক পরানো, ৬/১৪৪, হাদিস নং ৩০০৮।

৭৮ দ্রষ্টব্য, ইহসানুল হিন্দি, আহকামুল হারবি ওয়াস সালাম ফি দাওলাতিল ইসলাম, প্রথম সংস্করণ (দামেস্ক:প্র.বি, ১৯৯৩ খৃ.) পৃ. ২০৫।

"দ্বীনের ব্যাপারে কেনো জোর-জবরদস্তি নেই, ভ্রান্ত মত ও পথ থেকে সঠিক মত ও পথকে ছাঁটাই করে আলাদা করে দেয়া হয়েছে।"[৭৯]

৬. শত্রুরা মুসলিম বন্দী ও জিম্মিদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা বা প্রতারণা করলেও ইসলাম বন্দী ও জিম্মিদের সাথে তা করে না। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু তাআ'লা বলেছেন,

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾

"কোনো বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা উঠাবে না"।[৮০]

আমরা ইতোপূর্বে যে একটি হাদিস উল্লেখ করেছি তাতে ও এরূপ নির্দেশনা রয়েছে "রসূলুলল্লাহ সা. যখন কোনো সেনাবাহিনী কিংবা সেনাদলের উপর আমীর নিযুক্ত করতেন তখন বিশেষতঃ তাকে আল্লাহ তাআ'লাকে ভয় করে চলার উপদেশ দিতেন এবং তাঁর সঙ্গী মুসলিমদের প্রতি আদেশ করতেন তারা যেন ভালোভাবে চলে। আর (বিদায়লগ্নে) বলতেন, যুদ্ধ করো আল্লাহর নামে, আল্লাহর পথে। লড়াই করো তাদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহর সঙ্গে কুফরী করেছে। যুদ্ধ চালিয়ে যাও, তবে গনীমাতের মালের খেয়ানত করবে না, চুক্তি ভঙ্গ করবে না, শত্রু পক্ষের অঙ্গ বিকৃতি সাধন করবে না, কোনো শিশু সন্তানকে এবং উপাসনালয়ের লোকদেরকে হত্যা করবে না"।[৮১]

ইবন জারীর তাবারী কর্তৃক প্রণীত 'তারীখুর রুসুলি ওয়াল মুলূকি' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, একদা উমাইয়্যা খলিফা মুয়াবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান রোমানদের সাথে সন্ধি চুক্তি করতে ও তাদের বিশ্বাসঘাতকতার দরুণ জামানত স্বরূপ বন্ধক রাখতে বাধ্য হলেন। এতদসত্ত্বেও তারা তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলো। এরপর তিনি তাদের বন্ধক ফিরিয়ে দিলেন এই বলে,''নিশ্চয়ই বিশ্বাসঘাতকতার মোকাবেলায় বিশ্বাসঘাতকতার চাইতে বিশ্বাসঘাতকতার বিপরীতে বিশ্বস্ততাই উত্তম"।

---

৭৯ আল-বাকারাহ: ২৫৬।

৮০ আল-ফাতির: ১৮।

৮১ ইমাম আহমদ, মুসনাদে আহমদ, সম্পাদনা: ড. আবদুল্লাহ আত-তুর্কী ও তার সহকর্মীবৃন্দ, প্রথম সংস্করণ (বৈরুত: মুআস্সাতুর রিসালাহ, ১৪১৭ হি.) ৪/৪৬১, হাদিস নং (২৭২৮), সম্পাদক বলেছেন, এটি হাসান লি-গাইরিহী।

৭. যুদ্ধবন্দীদের সাথে সম্মানজনক আচরণের মধ্যে রয়েছে একই পরিবারের যারা বন্দী হয়েছে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে না দেওয়া। আবু আইয়্যুব রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি,

من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة

"যে ব্যক্তি মা ও তার সন্তানদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে তার প্রিয়জনদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবেন" ।৮২ ইমাম তিরমিযী বলেন, সাহাবা কিরামের মধ্যে বিজ্ঞজন ও অন্যরা এরূপ আমল করেছেন। তারা যুদ্ধবন্দীর মধ্য থেকে মা ও তার সন্তান, বাবা ও তার সন্তান এবং সহোদরদের মাঝে বিচ্ছেদ তৈরি করাকে অপছন্দ করতেন।৮৩ এ প্রসঙ্গে ইবনু কুদামাহ 'আল-মুগনী' গ্রন্থে বলেন, ''বিজ্ঞজনরা এই মর্মে একমত হয়েছেন যে, মা ও তার শিশু সন্তানকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্নকরণ বৈধ নয়" ।৮৪ অনুরূপভাবে পিতা ও তার সন্তান, দুই বোন ও দুই ভাইকে বিচ্ছিন্ন করাও বৈধ নয়। কোনো কোনো ফকীহ বলেছেন, এমনকি বিবাহ নিষিদ্ধ রক্ত সম্পর্কের এমন আত্মীয়দের মাঝেও বিচ্ছেদ জায়েয নেই। যেমন ফুফুর সাথে তার ভাইয়ের ছেলের বিচ্ছেদ এবং খালার সাথে তার ভাগ্নের বিচ্ছেদ ।৮৫ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, একবার আব্বাসী খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহ প্রচন্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর আরমেনিয়ার দুর্গসমূহের একটি দূর্গ দখল করেন। এরপর তিনি একই পরিবারের যারা বন্দী হয়েছে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন না করার নির্দেশ দিয়েছিলেন ।৮৬

৮. ইসলাম তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখাতে নিষেধ করেছে। যুদ্ধের সময় মানসিক প্রতিক্রিয়ার ফলে কিছু সৈনিক কর্তৃক এরূপ ঘটনা কখনো

---

৮২ ইমাম আহমদ, মুসনাদে আহমদ, (মিসর: মুআসসাতু করতোবা, তা.বি) ৫/৪১২। তিরমিযী, সুনানু তিরমিযী, সম্পাদনা: আহমদ মুহাম্মদ শাকের ও অন্যন্য (বৈরুত:দারু ইহয়ায়িত তুরাস আল-আরবি, তা.বি.) ৪/২৩ তিরমিযী বলেছেন, হাদিসটি হাসান গরীব।

৮৩ তিরমিযী, প্রাগুক্ত, ৪/১৩৪; মুহাম্মদ আবদুর রহমান ইবন আবদুর রহীম আল-মোবারকপুরী, তোহফাতুল আহওয়াযী বিশারহি জামেইত তিরমিযী (বৈরুত: দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ) ৫/১৫৪।

৮৪ ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী (রিয়াদ: মাকতাবাতুর রিয়াদ আল-হাদীসাহ, তা.বি) ৮/৪৬২।

৮৫ ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, ৮/৪২৩-৪২৪।

৮৬ দ্রষ্টব্য, আদাম মেটজ (Adam Metz), আল-হাদারাহ আল-আবাবিয়্যা ফিল কারনির রাবে' আল-হিজরী।

কখনো ঘটে থাকে। ইসলাম বন্দীদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছে, সে ব্যক্তি হোক কিংবা গোষ্ঠী হোক। কখনো কখনো কিছু কিছু সৈনিক ক্ষোভ প্রশমনের জন্য বন্দীর সাথে খারাপ ব্যবহার করে থাকে। ইসলামে এসব অনুমোদিত নয়। এ ক্ষেত্রে সকলকেই অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ না সেনাপ্রধান বন্দীদের ব্যাপারে সতর্কতার সাথে একটি সমন্বিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ অবশ্যই ক্ষোভের প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত থাকতে হবে এবং বন্দীদের সম্মান ও মানবিক মর্যাদা সংরক্ষণ করতে হবে। এ বিষয়ে স্কলারদের বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি এরূপ যে, বন্দীদের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিবেন প্রশাসক। তিনি যা সঠিক মনে করবেন সে ভাবে কাজ করবেন।[৮৭] ইবনু কুদামা বলেন, "কেউ কোনো ব্যক্তিকে বন্দী করলে সে তাকে হত্যা করতে পারবে না যতক্ষণ না সংশ্লিষ্ট ইমাম বা সংশ্লিষ্ট প্রধান নেতা এসে এ ব্যাপারে মতামত দেন। কেননা কেউ বন্দী হলে তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ইখতিয়ার থাকে শুধু ইমামের"।[৮৮] এই নিষেধাজ্ঞাটি বন্দীকে ক্ষোভের প্রকোপ ও বিজয়ের উল্লাস থেকে নিরাপদে রাখে যা সৈনিকরা আটক করার সময় করে থাকে। কোনো পক্ষের পরাজয় বরণের মুহূর্তে এবং অন্য পক্ষের সৈন্য কর্তৃক আটক হওয়ার সময় এ জাতীয় অনেক মানবতা বিরোধী অপরাধ সৈন্যদের পক্ষ থেকে সংঘটিত হয়। কিন্তু যখন সৈনিককে এরূপ মুহূর্তে প্রতিক্রিয়া দেখাতে নিষেধ করা হয় তখন এটি অবশ্যই বন্দীদের জন্য উত্তম রক্ষাকবচ হিসাবে ভূমিকা রাখে। যার ফলে তার সম্মান ও মানবিকতা রক্ষা পায় এবং সে যুদ্ধের প্রকোপ ও বিজয়ের উন্মাদনামুক্ত আচরণ পেয়ে থাকে।

এই নিষেধাজ্ঞার মধ্যে এটিও অন্তর্ভূক্ত যে, যুদ্ধের সময় একজন সৈনিক অন্য সৈনিকের আওতাধীন কোনো যুদ্ধবন্দীর সাথে সীমালঙ্ঘন মূলক আচরণ করতে পারবে না। যদি কোনো যোদ্ধাকে তার সহযোদ্ধার কোনো বন্দীকে দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হয় তাহলে সে তাকে হত্যা করতে পারবে না। হযরত সামুরা রা. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদিসটি এটিই প্রমাণ করে। তিনি বলেন,

"لا يعترض أحدكم أسير صاحبه ، فيأخذه فيقتله"

৮৭ দ্রষ্টব্য, ইবনু হাজর, ফাতহুল বারী, ৬/১৫১। আল-মাওয়ারদী, আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, পৃ. ১০৪।

৮৮ ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, ৮/৩৭৭।

"কেউ তার সহযোদ্ধার হাতে থাকা বন্দীর গতিরোধ করে তাকে আটক করতে পারবে না এবং হত্যা করতে পারবে না" ।৮৯

৯. বন্দীদের সাথে ইসলামের আচরণ হল দয়াদ্রপূর্ণ। " শব্দের ব্যবহার ছিল আরব জাতির কাছে উত্তম চরিত্রের ব্যাপার, যা দিয়ে তারা রীতিমত গর্ব করতো। যেমনটি জনৈক কবি বলেছেন,

لا نقتل الأسرى ولكن نفكهم إن أثقل الأعناق حمل المغارم

অর্থাৎ, "আমরা বন্দীদের হত্যা না করে ছেড়ে দেই, সবচেয়ে ভারী বোঝা হলো ঋণ বহন করা" ।৯০ বন্দীদের ব্যাপারে বিধান সম্বলিত কুরআনের প্রসিদ্ধ আয়াতটি হলো,

﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ﴾

"অতঃপর তোমরা যখন কাফিরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের ঘাড়ে আঘাত হানো। যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করবে, তখন তাদের শক্তভাবে বেঁধে ফেলো। অতঃপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ করো, না হয় তাদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করো যতক্ষণ না শত্রুরা আত্মসমর্পণ করে" ।৯১

বন্দীদের আটক করার পর যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে সুরক্ষায় রাখতে হবে। এসময় তাদের ব্যাপারে খলিফা কয়েক ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। এক. কোনো প্রতিদান ছাড়া তাদের ক্ষমা করে মুক্ত করে দেওয়া। রাসূল সা. তাঁর অনেক যুদ্ধে এই পন্থাটি অবলম্বন করেছেন। যেমনটি আমরা তার জীবনী পড়লে জানতে পারবো। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ আল্লাহ উক্ত আয়াতে প্রথমে এই পন্থাটিই উল্লেখ করে বলেনঃ

﴿ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾

৮৯ আবদুল্লাহ আদী আল জুরজানী, আল কামিলু ফি দুআ'ফাইর রিজাল, সম্পাদনা: ইয়াহইয়া মুখতার, দ্বিতীয় সংস্করণ (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৪০৯ হি.) ১/৩৩৬।

৯০ দ্রষ্টব্য, শাওকানী, ফাতহুল কাদীর আল-জামি' বাইনা ফান্নাই আর রিওয়ায়াহ ওয়াদ দিরায়াহ মিন ইলমিত তাফসীর, সম্পাদনা: আবদুর রহমান উমাইরা, দ্বিতীয় সংস্করণ (আল মানসূরা: দারুল ওয়াফা লিত্ তিবা'আহ ওয়ান নাশর্, ১৪১৮হি.) ৫/৪০।

৯১ সূরা মুহম্মদ: ৪।

"অর্থাৎ হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ করো, না হয় তাদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করো যতক্ষণ না শত্রুরা আত্মসমর্পণ করে"। এখানে " 'مَنّ' শব্দের অর্থ হলো, কোনো মুক্তিপণ ছাড়াই বন্দীকে ক্ষমা করে ছেড়ে দেওয়া। ক্ষমা করে দেওয়ার মধ্যে আলাদা একটা সম্মান আছে। এজন্যই রাসূল স. বদরের দিনে এই পন্থাটিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন।[৯২] আর এভাবেই ক্ষমা করে দেওয়ার ব্যাপারটি ইসলামে বন্দীদের ব্যাপারে প্রথম অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচিত। রাসূল সা. বদরের যুদ্ধের দিন বলেনঃ "যদি মুতঈম ইবন আদী -কাফিরদের অন্যতম একজন নেতা- জীবিত থাকতো, এবং বদর যুদ্ধের বন্দীদের মুক্তি কামনা করতো, আমি তার সম্মানার্থে তাদেরকে মুক্ত করে দিতাম"। এই সব বিষয় জোরালোভাবে প্রমাণ করে যে, ইসলামি শারীয়াহ মতে বন্দীদের ক্ষমা করে দেয়ার মধ্যেই মাহাত্ম্য আছে।

দ্বিতীয়ত. বন্দীদের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায় করা। বন্দী হয় অর্থ দিয়ে মুক্তিপণ দিবে, যেমনটি বদর যুদ্ধে ঘটেছিলো। নতুবা কাফিরদের নিকট বন্দী কোনো মুসলিমের মুক্তির বিনিময়ে মুক্তিপণ দিবে। তবে রাসূল সা. এই দুটিতে সীমাবদ্ধ ছিলেন না। বরং বন্দী কর্তৃক মুসলিম সন্তানদের লেখা-পড়া শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমেও তিনি মুক্তিপণ গ্রহণ করেছিলেন। আর এটি বন্দীর জন্য সহজ ব্যাপার ছিলো। এর মাধ্যমেই বোঝা যায়, ইসলাম মানুষকে কতটুকু স্বাধীনতা দেয় আর কিভাবে নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা নিরসনে ভূমিকা পালন করে।

তৃতীয়ত. বন্দীকে হত্যা করা।[৯৩] যেসব ইমাম এই মত দিয়েছেন তাদের পক্ষ থেকে এই ব্যাপারে কুরআন-হাদিসের অনেক দলিল পাওয়া যায়। যেমন, রাসূল সা. কিছু বন্দীকে হত্যা করেছিলেন যেমনটি সীরাতুন্নবী বিষয়ক গ্রন্থে বর্ণিত আছে। তা ছাড়া ইবনুল আরাবি রহ. ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে একটি আয়াতের حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ শীর্ষক অংশের ব্যাখ্যায় বলেনঃ "এটি ছিলো বদরের দিন যখন মুসলিমরা সংখ্যায় কম ছিলো। যখন তাদের সংখ্যা বেড়ে যায় তখন আল্লাহ তাআ'লা فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً এই আয়াত দিয়ে বন্দীদের ব্যাপারে দুইটি

[৯২] দ্রষ্টব্য, যারকানি, শারহুল মাওয়াহিবিল লাদুনিয়্যাহ, ১/৫৪৩-৫৪৪ তিনি সুহাইলি থেকে বক্তব্যটি বর্ণনা করেছেন।

[৯৩] দ্রষ্টব্য, ইমাম শাফিঈ, আল-উম্, দ্বিতীয় সংস্করণ, (বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ, ১৩৯৩ হি.) ৪/২৬০।

সিদ্ধান্তের যেকোন একটি গ্রহনের সুযোগ দিয়েছেন।৯৪ ইবনে আব্বাসের রা. পরবর্তী অনেক মুফাসসির এই মতের পক্ষে বলেছেন। এই মতের সারাংশ হলো, বন্দীদের হত্যা করার বিধান ইসলামের প্রথম দিকে ছিলো যখন মুসলিমরা সংখ্যায় কম ছিলো। এরপরে তাদের ব্যাপারে কেবল অনুগ্রহ ও মুক্তিপণ আদায়ের মাঝে ইখতিয়ারের বিধান আসে। এটা কোনো কোনো ফকীহ'র মত যাঁরা মনে করেন বন্দীদের হত্যা করা যাবে না। আবার অনেক স্কলারের মত হলো, উপরোক্ত তিনটি সিদ্ধান্তের মধ্যে শাসক যে কোনো একটাকে গ্রহণ করবেন। এই মতের উপর ভিত্তি করে এবং উক্ত বিষয়ের ব্যাপারে স্কলারদের মতানৈক্য উল্লেখ করে ইবনে রুশদ র. বলেন: "কেউ কেউ বলেন, বন্দীদের হত্যা করা যাবে না। আর হাসান ইবন মুহাম্মাদ আল-তামিমী র. বর্ণনা করেন, এই মতটিতে সাহাবীদের রা. ইজমা (ঐকমত্য) পাওয়া গেছে" ।৯৫ হাসান আল আতা র. মনে করেন, বন্দীদের হত্যা করা খলিফার উচিত নয়।৯৬ আবূ হায়্যান র. 'আল-বাহরুল মুহিত' গ্রন্থে বলেন:

"فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا"

“অতঃপর এসব কাফিরের সাথে যখনই তোমাদের মোকাবিলা হবে তখন প্রথম কাজ হবে তাদেরকে হত্যা করা। এভাবে তোমরা যখন তাদেরকে ভালোভাবে পর্যুদস্ত করে ফেলবে তখন বেশ শক্ত করে বাঁধো। এরপর (তোমাদের ইখতিয়ার আছে) হয় অনুকম্পা দেখাও, নতুবা মুক্তিপণ গ্রহণ করো যতক্ষণ না যুদ্ধবাজরা অস্ত্র সংবরণ করে।৯৭ শীর্ষক আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেনঃ "এই আয়াতে এটা স্পষ্ট যে, ঘাড়ে আঘাত হানা মানে হত্যা করা। এরপর শত্রুকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করার পর তাদেরকে বেঁধে ফেলতে হবে। বেঁধে ফেলার পর হয় তাদেরকে ছেড়ে

৯৪ ইবনুল আরাবী, আহকামুল কুরআন, সম্পাদনা: আলী মুহাম্মদ আল-বাজাবী (বৈরুত: দারুল ফিক্‌র, তা.বি.) ২/৮৭৯।

৯৫ ইবন রুশদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাছিদ, ষষ্ঠ সংস্করণ (বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ, ১৪০২ হি.) ১/৩৮২।

৯৬ ইবনুল আরাবী, আহকামুল কুরআন, ৪/১৭০৩।

৯৭ মুহম্মদ:৪।

দিয়ে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে হবে যেমনটি রাসূল সা. করেছিলেন সুমামাহ ইবন উস্‌সাল আল হানাফী'কে ছেড়ে দিয়ে। না হয় তাদের থেকে মুক্তিপণ নিতে হবে। যেমনটি একটি বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, রাসূল সা. মুক্তিপণ হিসেবে একজন মুসলিমের বদলে দুজন কাফিরকে ছেড়ে দিয়েছিলেন।[৯৮] এটা ওদের মতের সাথে মিলে যায় যারা বলেন, যুদ্ধের উদ্দেশ্য শত্রুকে নিঃশেষ করে দেওয়া নয়। বরং অন্যায় অত্যাচার দমন করাই যুদ্ধের উদ্দেশ্য। যখন এই উদ্দেশ্য সাধিত হবে এবং কিছুসংখ্যক শত্রু বন্দী হয়ে যাবে যারা যুদ্ধাপরাধী ছিলো না কিংবা অপরাধী হিসেবে চিহ্নিতও নয় তখন তাদের হত্যা করা বৈধ হবে না।

১০. ইসলামে 'আন্তর্জাতিক মানবিক আইনে'র ক্ষেত্রে একটি শারঈ উৎস হিসেবে সমাজিক রীতির (উরফ) অবস্থান বিবেচনা করার বিষয় আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। সে হিসেবে যদি অনেক রাষ্ট্র মিলে শত্রুকে বন্দী করে তাকে হত্যা না করার ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হয় কিংবা সেটাকে রীতি হিসেবে মেনে নেয় তখন এটা অনুসরণ করা ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য আবশ্যক হয়ে যাবে। এবং 'উরফ' হিসেবে সেটাকে সবার মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে। এর মাধ্যমে সেটা চুক্তি কিংবা কোনো 'উরফ'র উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা আন্তর্জাতিক সাধারণ আইনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এটা শাসকের কর্তৃত্বকে সংকীর্ণ করে ফেললেও এর মধ্যে মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ নিহিত আছে। আর এই ধরনের সামগ্রিক স্বার্থ ও সামষ্টিক কোনো চুক্তি বা সামাজিক রীতি বাস্তবায়নে ইসলামি রাষ্ট্রই সবার আগে এগিয়ে আসে। কারণ এর মধ্যে বন্দীদের রক্ষা করা ও সম্মান করার অর্থ নিহিত আছে।

---

৯৮ আবু হাইয়্যান আন্দালুসি, তাফসিরুল বাহরুল মুহিত, দ্বিতীয় সংস্করণ (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৪০৩ হি.) ৮/৭৪। এ বক্তব্য উপস্থাপনের পর আবু হাইয়্যান মাসআলাটিতে আলিমগণের মতপার্থক্য এবং এ আয়াতের সাথে فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ এর বাহ্যিক বিরোধ আলোচনা করেছেন।

তিন: নিখোঁজ ও নিহতদের অধিকার

যুদ্ধের পরে অনেক ব্যক্তি নিখোঁজ রয়ে যায় যাদের কোনো সংবাদ পাওয়া যায় না। এ ব্যাপারটি নিঃসন্দেহে মৃত ব্যক্তির চাইতেও নিখোঁজ হওয়া ব্যক্তির পরিবারের ক্ষেত্রে অধিক বেদনাদায়ক। কারণ তার সংবাদ পাওয়ার আশায় ও তার কষ্টের কথা চিন্তা করে তাদের বেদনার প্রহর আরো দীর্ঘ হয়। অনেকেই তো তাদের জীবনে স্থিরতা ও প্রশান্তি আনার জন্য নিখোঁজ আপনজনের মৃত্যু সংবাদের আশায় থাকে।

এজন্য শত্রু পক্ষকে মুসলিমদের কাছে আটককৃত বন্দীদের ব্যাপারে অবগত করা উচিৎ। বন্দীদের আটক করার বিষয়টি অস্বীকার করা যাবে না বা তাদের নামও গোপনে রাখা বৈধ হবে না। কারণ এতে করে তাদের প্রতি অবজ্ঞা করা হয় বা তাদের অধিকারগুলোকে খর্ব করা হয়। বন্দীর সাথে ইসলামি শারীয়াহ'র কাঙ্ক্ষিত আচরণ হলো তার ব্যক্তিত্বকে গুরুত্ব ও সম্মান দিয়ে তাকে মূল্যায়ন করা এবং তার ব্যাপারে সব তথ্য তার পরিবারের নিকট পৌঁছে দেওয়া। প্রতিটি যুদ্ধের পর সৈনিকের ব্যাপারে অবগত হওয়া এবং নিখোঁজ হওয়া ব্যক্তির সব তথ্য সংগ্রহ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত কোনো শত্রুপক্ষের মরদেহ মুসলিমদের কাছে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে ইসলামের অবস্থান হলো, ইসলাম মানুষকে জীবিত ও মৃত দুটো অবস্থাতেই সম্মান করতে শিখিয়েছে। মৃত অবস্থায় মানুষ যেসব ক্ষেত্রে মর্যাদা পায় তা হলো:

১. রাসূল সা. অঙ্গচ্ছেদ[৯৯] করতে নিষেধ করেছেন। যেমনটি বুরাইদাহ রা. এর একটি হাদিসে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূল সা. যখন কাউকে কোনো সৈন্যদলের দলনেতা বা সেনাপতি হিসেবে নিযুক্ত করতেন তখন তাকে বিশেষভাবে আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিতেন এবং মুসলিমদের সাথে ভালো আচরণের আদেশ দিতেন। এরপরে তিনি বলতেন, "তোমরা আল্লাহর নামে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো, আল্লাহকে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। তোমরা যুদ্ধ করো, তবে অতিরঞ্জন করো না, অঙ্গচ্ছেদ করো না, কোনো শিশুকে হত্যা করো না"।[১০০] হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "রাসূল সা.

---

৯৯ অঙ্গচ্ছেদ এর আরবি পরিভাষা হচ্ছে, আল-মুছলাহ () । এদ্বারা নিহত ব্যক্তির নাক, কান, ঠোঁট ও এজাতীয় কোন অংশ কেটে ফেলাকে বুঝায়। আস-সানাআ'নী, সুবুলুস সালাম শারহি বুলূগিল মুরাম (রিয়াদ: মুহাম্মদ ইবন সাউদ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৯৭ হি.) ৪/৯৬।

১০০ ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম ৩/১৩৫৭, হাদিস নং ১৭৩১।

যখনই কোনো খুৎবা প্রদান করতেন তখন 'সাদকা'র আদেশ দিতেন এবং অঙ্গচ্ছেদ করাকে নিষেধ করতেন" ।১০১

উহুদ যুদ্ধে যখন শত্রুরা নিহত মুসলিমদের অঙ্গচ্ছেদ করেছিলো- যেমনটি তাফসীরে তাবারীতে উল্লেখিত আছে- তখন রাসূল সা. বলেছিলেনঃ "যদি আমরা তাদের পরাজিত করতাম তাহলে তাদের ত্রিশজন ব্যক্তির অঙ্গচ্ছেদ করতাম" । যখন মুসলিমরা একথা শুনলো, তখন তারা বললো, আল্লাহর কসম! যদি আমরা তাদের পরাজিত করতাম, তাহলে তাদের এমন অঙ্গচ্ছেদ করতাম যার নজির আদৌ আরবের কেউ কখনো দেখাতে পারে নি। তখন আল্লাহ এই আয়াতটি নাযিল করেন,

﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّٰبِرِينَ﴾

"যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহন করো, তাহলে ততটুকুই গ্রহন করো যতটুকু তোমাদেরকে কষ্ট দেওয়া হয়েছে। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো তাহলে সেটা হবে ধৈর্যশীলদের জন্য কল্যাণজনক" ।১০২

ইমাম তাবারী র. বলেন, "এরপর রাসূল সা. দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন যে, অঙ্গচ্ছেদ করবেন না। অতঃপর অঙ্গচ্ছেদ করাকে নিষেধ করে দেন।১০৩ সুতরাং বুঝা গেলো, শত্রুপক্ষের নিহতদের অঙ্গচ্ছেদ করা বৈধ নয়।১০৪ ইমাম সানআনী র. 'সুবুলুস সালাম' গ্রন্থে বলেছেনঃ "বুরাইদা রা. বর্ণিত উপরোক্ত হাদিসটি এটাই প্রমাণ করে যে, অঙ্গচ্ছেদ করা ও মুশরিকদের শিশুদের হত্যা করা হারাম" । এরপর তিনি বলেনঃ "এগুলো হারাম হওয়ার ব্যাপারে ইজমা (ঐকমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে" ।১০৫ ইমাম আয-যামাখশারী র. বলেনঃ "অঙ্গচ্ছেদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নাই। এটা নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে হাদিস

১০১ আল-বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা ৯/৬৯।

১০২ আন-নাহল:১২৬ ।

১০৩ আল-তাবারী, তাফসীর আল-তাবারী (বৈরুত: দারুল ফিক্‌র, ১৪০৫ হি.) ১৪/১৭৬।

১০৪ দ্রষ্টব্য, ইবনু কুদামা, আল-কাফী, সম্পাদনা: যুহাইর আশ-শাওইশ, ৫ম সংস্করণ, (বৈরুত: মাকতাবাতুল ইসলামি, ১৪০৮ হি.) ৪/২৭২।

১০৫ সানআনী (রঃ) 'সুবুলুস সালাম' ৪/৯৭।

বর্ণিত হয়েছে। এমনকি কোনো লোলুপ কুকুরকেও অঙ্গচ্ছেদ করা যাবে না" ।১০৬

২. যেমনিভাবে ইসলাম নিহতদের অঙ্গচ্ছেদ করতে নিষেধ করে তেমনিভাবে তাদের মস্তকগুলো বহন করা এবং সেগুলোকে জনসমক্ষে উপস্থাপন করাকেও নিষেধ করেছে। ইমাম যুহরী র. বলেছেনঃ "রাসূল সা. এর নিকট কখনো কোনো মস্তক বহন করে আনা হয়নি" ।১০৭ মুহাম্মাদ ইবন হাসান আশ-শায়বানী র. বর্ণনা করেন, উকবাহ ইবন আমির আল-জুহানী রা. একবার খলীফা আবু বাকারের রা. কাছে মুশরিকদের মধ্য থেকে নিহত একজনের মাথা বহন করে নিয়ে আসেন। আবু বকর রা. এই বিষয়টিকে অপছন্দ করেন। তখন তিনি তাঁর সেনাপতিদের চিঠি লিখে পাঠান যেখানে তিনি বলেছেনঃ "আমার কাছে যেনো কোনো মাথা বহন করে আনা না হয়। সেটা করলে তোমরা হবে সীমালঙ্ঘনকারী। আমার জন্য চিঠি এবং সংবাদই যথেষ্ট" ।১০৮ অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেছেন: "এটা একমাত্র অনারবদের রীতি" ।১০৯ তার মানে হলো ইসলামে শরীয়াহ প্রবর্তনের যুগে মস্তক বহন করার প্রচলন ছিল না। আর আবু বকর রা. এর মন্তব্য 'এটা অনারবদের রীতি' দ্বারা বোঝা গেলো, এটি খুব জঘন্য ও অপছন্দনীয় কাজ যা বৈধ না হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে। যদি এই ধরনের কোনো কিছু ঘটে থাকে তাহলে সেটা একমাত্র শত্রুদের সীমলঙ্ঘন মূলক হিংস্র আচরণের কারণেই ঘটেছিলো যেমনটি আমরা 'সীরাহ'র গ্রন্থগুলোর মাধ্যমে জানতে পারি যেখানে যুদ্ধের পর মৃত শত্রুদের মাথা বহন করে আনার প্রমাণ পাওয়া যায়।১১০ তখন বিধানটির কার্যকারিতা হবে একটি সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ

১০৬ দ্রষ্টব্য, আল-যামাখশরী, আল-কাশশাফ আন হাকায়িকিত তানযিল ওয়া উয়ূনুল আকভীল ফী উজহিত তা'ভীল, সম্পাদনা: মুহাম্মদ আস-সাদিক কামহাভী (মিসর: মোস্তফা আল-বাবী আল-হালাবী, ১৩৯২ হি.) ২/৪৩৫।

১০৭ আল-বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা ৯/১৩২-১৩৩। ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ৮/৪৯৪। যুহাইলী বলেন: (আবু জাহলের মস্তক কেটে বহনের বিষয়ে বর্ণনার ব্যাপারে আলিমদের মতবিরোধ রয়েছে এবং সঠিক মত হচ্ছে, এটি প্রমাণিত নয়) আছারুল হারবি ফিল ফিকহিল ইসলামি, পৃ. ৪৮৪।

১০৮ দ্রষ্টব্য, মুহাম্মদ আল-হাসান আশ-শায়বানী, আস-সিয়ারুল কাবীর ১/৭৯। আল-বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা ৯/১৩২।

১০৯ আল-বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা ৯/১৩২-১৩৩।

১১০ দ্রষ্টব্য, ইসমাইল আবু শারীয়াহ্, নাযরিয়্যাতুল হারবি ফিল ইসলাম, প্রথম সংস্করণ (কুয়েত: মাকতাবাতুল ফালাহ, ১৪০১ হি.) পৃ. ৫২০।

পরিসরে এবং কিছু নির্দিষ্ট ব্যক্তির ক্ষেত্রে যারা শত্রুতা করতে গিয়ে সীমালঙ্ঘন করে ফেলেছে এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে অন্যায় সাধন ও তাদেরকে কষ্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে সব ধরনের সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

৩. মানবিক মর্যাদা রক্ষা করার নিমিত্তে শত্রুদের মরদেহগুলোকে এমন স্থানে রাখা যাবে না যেখানে হিংস্র/দংশনপ্রবণ পাখি ও প্রাণীরা এসে সেগুলোকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিবে। বরং তাদের দেহগুলোকে লোকচক্ষুর আড়ালে এবং এমন জায়গায় রাখতে হবে যেখানে তাদের মানবিক সম্মানে ব্যাঘাত ঘটবে না। ইসলাম যেমনিভাবে মুসলিম কর্তৃক শত্রুদের মরদেহের অঙ্গচ্ছেদ করাকে নিষেধ করেছে তেমনিভাবে মরদেহগুলোকে এমনভাবে রক্ষা করতে আদেশ দিয়েছে যে, কোনো হিংস্র প্রাণি বা কোনো দংশনপ্রবণ পাখি এসে যেন সেগুলোকে অঙ্গচ্ছেদ করে খন্ড বিখন্ডিত করতে না পারে।[১১১] কিছু উদ্ধৃতিতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সা. কাফিরদের মরদেহগুলোকে লুকিয়ে রাখতেন এবং সেগুলোকে কোনো খোলা জায়গায় রেখে আসতেন না। বদর যুদ্ধে রাসূল সা. কাফিরদের মরদেহগুলোকে একটি কূপে রেখে আসতে আদেশ দেন। তিনি উমাইয়া ইবন খালফের মরদেহকে কূপে টেনে আনা সম্ভব ছিলো না বিধায় তাকে এমন এক জায়গায় লুকিয়ে রাখেন যেখানে কোনো হিংস্র প্রাণী থাকার সম্ভাবনা ছিলো না।[১১২] তিনি যখন কোনো মরদেহের পাশ দিয়ে যেতেন তখন তার ধর্ম সম্পর্কে না জেনেই তাকে লুকিয়ে রাখার আদেশ দিতেন। ইয়া'লা ইবন মুররাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলের সা. সাথে একাধিকবার সফর করেছি। তিনি যখন কোনো মরদেহের পাশ দিয়ে যেতেন তখন সেটাকে দাফনের আদেশ দিতেন। এক্ষেত্রে সে কি মুসলিম ছিলো না কাফির ছিলো এ নিয়ে তিনি কোনো প্রশ্ন করতেন না।[১১৩] এইসব উদ্ধৃতির মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয় যে, ইসলামে নিহত শত্রুর মরদেহকে দাফন করা ওয়াজিব। কারণ এর

---

১১১ দ্রষ্টব্য, আবুল খায়র আহমদ আতিয়্যাহ্, হিমায়াতুস সুক্কান আল মাদানিয়্যীন ওয়াল আ'য়ন আল-মুদুনিয়্যাহ ইব্বানাল হারবি, পৃ. ১০৭।

১১২ ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ আন-নবাভিয়্যাহ, সম্পাদনা: আদিল আহমাদ আবদুল মওজুদ, প্রথম সংস্করণ (রিয়াদ: মাকতাবাতুল আবিকান, ১৪১৮ হি.) ১/২৩০।

১১৩ দারু কুতনী, সুনানে দারে কুতনী (সুনানে দারে কুতনী উপর টীকা সহ প্রকাশিত গ্রন্থ) ৪/১১৬ কিতাবুস সিয়ার, নং ৪১।

মাধ্যমে তার মানবিকতাকে সম্মান দেখানো হয়। তাছাড়া তাদের পরবর্তি হিসাব আল্লাহর উপর ন্যস্ত করা হয়।[১১৪]

এটাই হলো মানুষের প্রতি বাস্তবিক অর্থে সম্মান প্রদর্শন। চাই সে জীবিত হোক বা মৃত; এক্ষেত্রে কোনো ধর্ম বা বিশ্বাসের তারতম্য তার সম্মানে ব্যাঘাত ঘটাতে পারবে না।

চার: বেসামরিক[১১৫] অধিবাসীদের অধিকার

ইসলামি শারীয়াহ আজ থেকে চৌদ্দশ বছর আগেই সামরিক আর বেসামরিক অধিবাসীদের অধিকার আর সুযোগ সুবিধার মধ্যে যে তফাৎ আছে, সেটার মূলনীতি বাতলে দিয়েছে। এক্ষেত্রে ইসলাম তার শারঈ উদ্ধৃতিগুলো উল্লেখ করে, সেগুলোর ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে সামরিক আর বেসামরিক অধিবাসীদের মধ্যে তফাৎ করে দেখিয়েছে। যে কোনো ধরনের ক্ষতি আর অন্যায় থেকে বেসামরিক লোকজনদের রক্ষা করাকে ইসলাম ওয়াজিব করে দিয়েছে। আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾

"তোমরা আল্লাহর পথে সেই লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, কিন্তু সীমা অতিক্রম করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমা লঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না।"[১১৬]

ইবনুল আরবি র. এই আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ "যুদ্ধ করা হবে তাদের বিরুদ্ধে, যারা যুদ্ধ করবে। সাধারণত তারা হচ্ছে, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ। ফলে নারী, শিশু আর ধর্মীয় সন্ন্যাসীরা এর অন্তর্ভুক্ত নয়"।[১১৭] আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি (وَلَا تَعْتَدُوا) এর ব্যাখ্যায় বলেনঃ "তোমরা নারী,

---

১১৪ দ্রষ্টব্য, ইসমাইল আবু শারীয়াহ্, নাযরিয়্যাতুল হারবি ফিল ইসলাম, পৃ. ৫১৪।

১১৫ বেসামরিক নাগরিক বলতে বুঝায়, এমন নারী, শিশু, দূত ও অন্যান্য মানুষ যারা শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে না এবং যুদ্ধবিষয়ক কর্মকান্ডে অংশগ্রহন করে না। দ্রষ্টব্য: হাসান আবূ গুদ্দাহ, কাদায়া ফিকহিয়্যা ফিল আ'লাকাতিদ দুআলিয়্যা, পৃ. ২৬৯।

১১৬ সূরা আল-বাক্বারাহঃ ১৯০

১১৭ দ্রষ্টব্য, ইবনুল আরবি, আহকামুল কুরআন, ১/১০৪।

শিশু আর বৃদ্ধদের সাথে যুদ্ধ করো না"।[১১৮] পাশাপাশি অন্ধ, সন্ন্যাসী আর কৃষকরাও এই হুকুমের আওতাভুক্ত।[১১৯]

আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে রাসূল সা. একজন সৈনিককে যুদ্ধে পাঠানোর সময় উপদেশ হিসেবে সামরিক আর বেসামরিকের পার্থক্যের ব্যাপারটা গুরুত্ব দিয়ে বলেনঃ

"انْطَلِقُوا بِاسْمِ اللَّهِ ، وَبِاللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ، لا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا ، وَلا طِفْلا ، وَلا صَغِيرًا ، وَلا امْرَأَةً ، وَلا تَغُلُّوا ، وَضُمُّوا غَنَائِمَكُمْ ، وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ"

"তোমরা আল্লাহর নামে, আল্লাহর সাহায্য নিয়ে এবং রাসূল সা. এর আদর্শের উপর অটল থেকে এগিয়ে যাও। তোমরা কোনো বয়োবৃদ্ধ, শিশু, অপ্রাপ্তবয়স্ক ও নারীকে হত্যা করো না। তোমরা সীমা লঙ্ঘন করো না। গনীমতের সম্পদগুলো সুষম বণ্টন করো। সবার মাঝে মীমাংসা করে দিও। আর সৎ কাজ করবে। আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন"।[১২০]

আমরা লক্ষ্য করলে দেখবো, রাসূল সা. এই মহৎ উপদেশবাণিতে তিন শ্রেনীর মানুষকে হত্যা না করার মূলনীতি বাতলে দিচ্ছেন। তারা হচ্ছেঃ-

১/ বয়োবৃদ্ধ।

২/ অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু।

৩/ নারী।

তিনি বলছেনঃ "তোমরা কোনো বয়োবৃদ্ধ, শিশু, অপ্রাপ্তবয়স্ক ও নারীকে হত্যা করো না"। হাদিসে উল্লেখিত এইসব শ্রেণীর মানুষদের কাছ থেকে স্বাভাবিক

---

১১৮ ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী ৮/৪৭৭।

১১৯ দ্রষ্টব্য, ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী ৮/৪৭৭-৪৭৯। তাদেরকে হত্যার নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে যদি তারা যুদ্ধ না করে। যদি তারা যুদ্ধ করে তাহলে তারা আর বেসামরিক হিসেবে থাকবে না, বরং তাদেরকে যুদ্ধের সৈনিক হিসেবে ধরা হবে এবং তাদের সাথে সামরিকদের মতই আচরণ করা হবে। মুহাম্মদ আল-হাসান আল-শায়বানী, আল-সিয়ারুল কাবীর, আল-সারাখসীর ব্যখ্যাসহ প্রকাশিত, ৪/১৮৭; ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী ৮/৪৭৮।

১২০ আবু দাউদ, সুনানু আবী দাউদ, সম্পাদনাঃ মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন আবদুল হামিদ, (বৈরূতঃ দারুল-ফিকর, তা. বি.), ৩/৩৭। আহমাদ ইবনু হুসাইন আল-বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, সম্পাদনাঃ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির আতা (মক্কাঃ দারুল বায, ১৪১৪হি.), ৭/৯০।

অবস্থায় কখনো সামরিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করাটা কল্পনা করা যায় না। ইসলামের দৃষ্টিতে যুদ্ধের লক্ষ্য হচ্ছে অন্যায় ও অত্যাচার দমন করা; শত্রুকে নির্মূল করা নয়। ফলে এই লক্ষ্য (অন্যায় ও অত্যাচার দমন) সাধিত হওয়ার পর বাড়াবাড়ি করে যুদ্ধ অব্যাহত রাখাটা একদম অনুচিত। এতটুকু আলোচনায় আমরা জেনেছি, উল্লেখিত শ্রেণির মানুষদের হত্যা করা বৈধ না হওয়ার কারণ হচ্ছে, যুদ্ধে তাদের অংশগ্রহণ না থাকা। তাহলে এদের বাইরে কোনোভাবেই যুদ্ধে যাদের অংশগ্রহণ পাওয়া যাবে না তারাও উল্লেখিত তিন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ও বেসামরিক নাগরিক হিসেবে পরিগণিত হবে।

রাসূল সা. যখনই কোনো বাহিনীকে যুদ্ধে প্রেরণ করতেন তখন প্রায়ই তিনি সেনাপতিকে এই ধরনের উপদেশ দিতেন। তিনি সবসময় তাদেরকে নারী, শিশু ও গীর্জার লোকদের হত্যা করতে নিষেধ করতেন। তার উদাহারণ হলো, আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. হতে বর্ণিত একটি হাদিসে তিনি বলছেন: "রাসূল সা. যখন যুদ্ধে কোনো সৈন্যদল পাঠাতেন তখন তিনি বলতেন, (তোমরা আল্লাহর নামে বের হও। যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। বিশ্বাসঘাতকতা করো না, বাড়াবাড়ি করো না, অঙ্গচ্ছেদ করো না, কোনো শিশু এবং কোনো গীর্জার লোককে হত্যা করো না" ।১২১ ইবনে কা'ব ইবন মালিক রা. তাঁর চাচার বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, "রাসূল সা. যখন ইবনে আবিল হুকাইককে রা. খাইবারে প্রেরণ করেছিলেন, তখন তাঁকে নারী আর শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করেছিলেন" ।১২২ ইবন উমার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "রাসূল সা. কোনো এক যুদ্ধক্ষেত্রে একজন মহিলাকে নিহত অবস্থায় পেলেন। অতঃপর তিনি নারী আর শিশুদের হত্যা করাকে অপছন্দ করলেন" ।১২৩ ইমাম আহমাদ রাহ. এর একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়, রাসূল সা. বলেন, এই মহিলাটি তো যুদ্ধ করে নি। এরপর রাসূল সা. নারী আর শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করেন ।১২৪ এখানে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করাটা স্পষ্টভাবে তাকে হত্যা না করার কারণ হিসেবে বুঝানো হচ্ছে। সুতরাং যে যুদ্ধ করবে না তাকে হত্যা করা বৈধ হবে না।

১২১ ইমাম আহমাদ, মুসনাদু আল-ইমাম আহমাদ, সম্পাদনা, ড. আবদুল্লাহ তুর্কী ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ, প্রথম সংস্করণ (বৈরুতঃ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪১৭হি.), ৪/৪৬১, হাদীস নংঃ ২৭২৮, সম্পাদকের মতে, হাদিসটি 'হাসান লিগাইরিহী'।

১২২ ইমাম আহমাদ, মুসনাদু আল-ইমাম আহমাদ, ৩৯/৫০৬, হাদীস নংঃ ২৪০০৯, ৪/৪৬১, হাদীস নংঃ ২৭২৮, সম্পাদকের মতে, হাদিসটি 'হাসান লিগায়রিহী'।

১২৩ ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, ৩/১৩৬৪, হাদিস নংঃ ১৭৪৪।

১২৪ ইমাম আহমাদ, মুসনাদু আল-ইমাম আহমাদ, ১০/১৭৩, হাদিস নংঃ ৫৯৫৯।

রাসূল সা. হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে রা. উপদেশ দিতে গিয়ে বলেনঃ

"لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا"

"তুমি কোনো সন্তান এবং কোনো 'আসীফ'কে হত্যা করো না" ।১২৫ কুলি অথবা কৃষককে 'আসীফ' বলা হয় ।১২৬ রাসূলের সা. উপরোক্ত উপদেশগুলো যুদ্ধের সময় নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের মত বেসামরিক লোকদের উপর হামলে পড়তে বারণ করে যারা সাধারণতঃ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না। অধিকন্তু আমরা লক্ষ্য করলে দেখবো, রাসূল সা. ইতোপূর্বে উল্লেখিত হাদিসে এই তিন শ্রেণীর বেসামরিক লোকদের সাথে আরো এক শ্রেণীর মানুষকে যুক্ত করেছেন যখন তিনি বলেছেনঃ

"ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلون الوالدان ولا أصحاب الصوامع"

"তোমরা বিশ্বাসঘাতকতা করো না, বাড়াবাড়ি করো না, অঙ্গবিকৃতি করো না, কোনো শিশু এবং কোনো গীর্জার লোককে হত্যা করো না" ।১২৭ এরা হচ্ছে পাদ্রী শ্রেণীর লোক যারা গীর্জা কিংবা উপাসনালয়ে তাদের সময় অতিবাহিত করে। হযরত আবু বাকার রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি উপদেশ দিতে গিয়ে বলেনঃ "তোমরা আনুগত্যের শপথ ভঙ্গ করো না" ।১২৮ এই ইঙ্গিতের মাধ্যমে আমরা দুটো বিষয় বুঝতে পরি।

এক. ইসলাম গীর্জার লোকদের সম্মান দিয়েছে এবং তাদের সাথে খারাপ আচরণ করতে নিষেধ করেছে। এদের মত অন্যান্য যারা উপাসনালয়ে ব্যস্ত থাকে এবং যুদ্ধে যাদের অংশগ্রহণ পাওয়া যায় না, তারাও এই বিধানের আওতাভুক্ত।

দুই. সে সব গীর্জা কিংবা উপাসনালয়গুলোও আবশ্যিকভাবে রক্ষা করতে হবে এবং যুদ্ধের সময় সামরিক উদ্দেশ্যে এইগুলো ব্যবহৃত না হলে তা কোনোভাবেই ধ্বংস করা যাবে না। আমার মতে লাইব্রেরি, একাডেমিক ভবন, শিক্ষায়তন ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মত অন্যান্য সাংস্কৃতিক স্থানগুলোর সাথেও উপরোক্ত বিধানকে জুড়ে দেয়া যাবে, যেহেতু এই স্থানগুলো গীর্জা কিংবা

১২৫ ইবনু হিব্বান, সহীহ ইবন হিব্বান, ১১/১১২। হাকিম, আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন ২/ ১৩৩।

১২৬ আল-করতুবী, তাফসীরুল করতুবী, দ্বিতীয় সংস্করণ, (কায়রোঃ দারুশ শা'ব, ১৩৭২হি.), ২/৩৪৯।

১২৭ ইমাম আহমাদ, মুসনাদু আল-ইমাম আহমাদ, সম্পাদনাঃ ড. আবদুল্লাহ তুর্কী ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ, প্রথম সংস্করণ (বৈরূতঃ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪১৭হি.) ৪/৪৬১, হাদিস নংঃ ২৭২৮, সম্পাদকের মতে, হাদিসটি 'হাসান লিগায়রিহি'।

১২৮ আহমাদ ইবন হুসাইন আল-বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, সম্পাদনাঃ মুহম্মাদ আবদুল কাদির আত্মা (মক্কাঃ দারুল বায, ১৪১৪হি.) ৯/৮৫।

উপাসনালয়গুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং দুটোই একই প্রেক্ষাপট কিংবা একই উদ্দেশ্য লালন করে। খলীফা আবু বকর রা. রাসূল সা. এই উপদেশ বাণীগুলো যথাযথভাবে কাজে লাগিয়েছেন। তিনি ইয়াযিদ ইবন আবু সুফীয়ানকে রা. সিরিয়ায় প্রেরণ করার সময় নারী, শিশু ও গীর্জার পাদ্রীদের হত্যা না করতে আদেশ দেন, যদি না তাদের পক্ষ থেকে কোনো ক্ষতি সাধিত হওয়ার আশংকা থাকে।১২৯ তিনি উপদেশ হিসেবে আরো বলেনঃ "তোমরা এমন কিছু লোক পাবে যারা গীর্জায় নিজেদের আবদ্ধ করে রেখেছে। তাদেরকে তারা যে কাজে নিয়োজিত রেখেছে তার উপর ছেড়ে দাও" ।১৩০ সে সময় সিরিয়ায় ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের গীর্জা ও উপাসনালয় বিদ্যমান ছিল যেখানে কিছু মানুষ সারাক্ষণ উপাসনায় নিমগ্ন থাকতো। আবু বকর রা. তাদের সাথে সদাচরণ করতে আদেশ দিতেন। কারণ হত্যাযজ্ঞ সাধনে, মতামত কিংবা কাজের ক্ষেত্রে তাদের কোনো ধরনের প্রভাব ছিলো না। সুতরাং গীর্জা কিংবা উপাসনালয়ের লোকদের হত্যা করার অর্থ হলো: তাদের উপর অন্যায় করা, যা ইসলামে নিষিদ্ধ। ইবনে কাসীর রাহ. তাঁর তাফসীর গ্রন্থে এর উপরেই আলোকপাত করেছেন ।১৩১

আবু বকর রা. ইয়াজিদ ইবন আবু সুফীয়ানকে রা. সিরিয়ায় প্রেরণ করার সময় আরো উপদেশ দেন,

"لا تقتلوا صبياً ولا امرأة ولا شيخاً كبيرًا ولا مريضًا ولا راهبًا ولا تقطعوا مثمرًا ولا تخربوا عامرًا ولا تذبحوا بعيرًا ولا بقرة إلا لمأكل ولا تغرقوا نحلاً ولا تحرقوه"

"তোমরা কোনো শিশু, নারী, বৃদ্ধ, অসুস্থ ও পাদ্রীকে হত্যা করো না। কোনো ফলদার বৃক্ষ কর্তন করো না। কোনো আবাদকৃত ভূমি বিরান করো না। খাওয়ার উদ্দেশ্য ব্যতিত অন্য কোনো অবস্থায় কোনো উট এবং কোনো গবাধি পশু জবাই করো না। কোনো মৌচাক নষ্ট করে তা আগুনে পুড়িয়ে দিও না" ।১৩২ আবু বকর রা. এই উপদেশ বাণী যুদ্ধের সময় কোনো ফলের গাছ কাটতে, আবাদকৃত ভূমি বিরান করতে, খাওয়ার উদ্দেশ্য ব্যতিত কোনো গবাদি পশু জবাই করতে ও

---

১২৯ ইমাম আহমাদ, মুসনাদু আল-ইমাম আহমাদ, সম্পাদনাঃ ড. আবদুল্লাহ তুর্কী ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ, প্রথম সংস্করণ (বৈরূতঃ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪১৭হি.) ৪/৪৬১, হাদিস নংঃ ২৭২৮, সম্পাদকের মতে, হাদিসটি 'হাসান লিগায়রিহি'।

১৩০ আহমাদ ইবন হুসাইন আল-বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, সম্পাদনাঃ মুহম্মাদ আবদুল কাদির আত্মা (মক্কাঃ দারুল বায, ১৪১৪হি.) ৯/৮৫।

১৩১ দ্রষ্টব্য, ইবনুল আরবি, আহকামুল কুরআন ১/১০৪।

১৩২ আল-বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, তা.বি.) ৯/৮৫।

কোনো মৌচাক নষ্ট করতে নিষেধ করেন।১৩৩ এই উপদেশটি বেসামরিক লোকদের নাগরিক সুযোগ সুবিধার নামে যা কিছু আছে সবগুলোকেই অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে অন্তর্ভুক্ত করেছে। তবে যুদ্ধে ব্যবহৃত নয় শত্রুর এমন সম্পদকে নষ্ট করার ক্ষেত্রে ফকীহদের মাঝে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়।১৩৪ ইবনু কুদামাহ র. গাছ ও শস্যকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন।

এক. যে বৃক্ষ কিংবা শস্যের মধ্যে শত্রুপক্ষ লুকিয়ে থাকে এবং নিজেকে সুরক্ষা করে। এগুলো অবশিষ্ট থাকলে শত্রুপক্ষ সামরিক দিক লাভবান হয়। 'ফকীহগণ সবাই ঐক্যমত্য পোষণ করেছেন যে, এই ধরনের বৃক্ষ কিংবা শস্য কাটা বৈধ। কারণ শত্রুপক্ষ এর থেকে সাহায্য গ্রহণ করে।

দুই. যা অবশিষ্ট থাকা মুসলিমদের জন্য লাভজনক। এবং যা সাধারণত কাটার প্রচলন নেই। এই ধরনের গাছ কিংবা শস্য কাটা বৈধ নয়।

তিন. যা কাটলে মুসলিমদের কোনো উপকারিতা বয়ে আনে না; বরং এর মাধ্যমে মুসলিমদের প্রতি কাফিরদের রাগ আরো বৃদ্ধি পায়। এই ধরনের গাছ কিংবা শস্য কাটা বৈধ হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায়।১৩৫

এটা হলো গাছ কিংবা শস্য কাটার ব্যাপারে একটি দৃষ্টিভঙ্গি। অনেকেই আছেন যারা শত্রুর জড়সম্পদ ও প্রাণিজ সম্পদকে আলাদা করে দেখেন। তাঁরা প্রথমটাকে নষ্ট করে দেওয়াকে বৈধ মনে করেন আর পরেরটার ক্ষেত্রে বৈধ মনে করেন না। আবার অনেকেই মনে করেন, যুদ্ধে ব্যবহৃত হয় না শত্রুর এমন সম্পদকে ধ্বংস করা বৈধ। কারণ এর মাধ্যমে শত্রুর মনোবল দুর্বল হয়ে যায় এবং তার ক্রোধ আরো বৃদ্ধি পায়।১৩৬

উপরিউক্ত বিশ্লেষণে সামরিক আর বেসামরিক নাগরিক এবং তাদের উদ্দেশ্যের মাঝে তফাৎ সুস্পষ্ট হয়েছে। আবু বকর রা. এর নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত উপদেশ গ্রহণ করলে বুঝা যাবে, অস্ত্র নিয়ে বেসামরিক লোকদের আঘাত করে তাদের হত্যা করা ইসলামে বৈধ নয়। অনুরূপভাবে অসংখ্য ফকীহগণের মতে, (ইবনে

---

১৩৩ কিছু বর্ণনায় 'النحل' শব্দটিতে 'ح'এর বদলে 'خ' দিয়ে বর্ণিত আছে। এর মানে হলো النخل তথা খেজুর বৃক্ষ।

১৩৪ দ্রষ্টব্য, হাসান আবু গদ্দাহ, কাদ্বায়া ফিকহীয়্যাহ ফিল আলাকাতিত দউলিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ (রিয়াদ:মাকতাবাতুল আবিকান, ১৪২০ হি.) পৃঃ ২৫।

১৩৫ দ্রষ্টব্য, ইবনু কদামাহ, আল-মুগনী, ৮/৪৫৩-৪৫৪।

১৩৬ দ্রষ্টব্য, হাসান আবু গদ্দাহ, কাদ্বায়া ফিকহীয়্যাহ ফিল আলাকাতিত দয়ালিয়্যাহ, পৃ.৭৩।

কুদামার র. উল্লেখিত সম্পদ ব্যতীত) অবশিষ্ট কোনো বেসামরিক সুযোগ কিংবা সম্পদ নষ্ট করা বৈধ হবে না। আর যারা এমন কাজ করবে এইসব ফকীহগণের মতে তারা সীমালঙ্ঘনকারী হিসেবে পরিগণিত হবে যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ

﴿ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾

"তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না" ।১৩৭

কারণ, গাছপালা পুড়িয়ে ফেলা ও কোনো স্বার্থ ছাড়াই গবাদি পশু হত্যা করা অন্যায় কিংবা সীমালংঘনের অন্তর্ভুক্ত এবং তা ন্যায় বহির্ভূত কাজ ।১৩৮ যে ন্যায়ের ব্যাপারে আল্লাহ বলছেন:

"আপনি বলুন, আমার রব ন্যায়ের আদেশ দিয়েছেন" ।১৩৯ সুতরাং বেসামরিক নাগরিকদের আক্রমণ কিংবা আঘাত করা ন্যায় বহির্ভূত কাজ। যদি বেসামরিক লোক কাফির হয়, তখন তার ব্যাপারটা আল্লাহই ভালো বুঝবেন। সে কিয়ামাতের দিন আল্লাহর নিকট যোগ্য প্রতিদান পাবে ।১৪০ এই ব্যাপারে আল্লাহ আমাদের কর্তৃত্ব দেন নি। যুদ্ধের উদ্দেশ্য হলো, অরাজকতা ও নৈরাজ্য দূর করা। যারা যুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় তাদের ক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্য সাধিত হয় না যথা বৃদ্ধ, পাদ্রী, নারী, শিশু ইত্যাদি ।১৪১

মোদ্দাকথা, উল্লেখিত উদ্ধৃতিসমুহ ও উপদেশগুলোর আলোকে, নারী, শিশু, গীর্জার লোক, বৃদ্ধ ও যারা যুদ্ধে সক্ষম হওয়া সত্বেও যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে তাদেরকে কখনো হত্যা করা যাবে না ।১৪২ কারণ উপরিউক্ত নিষেধাজ্ঞাটি গীর্জার লোক ও নারীদের পাশাপাশি যারা সক্ষমতা থাকা সত্বেও কোনো ধরনের মতামত

---

১৩৭ আল-বাকারাহ: ১৯০।

১৩৮ দ্রষ্টব্য, ইবুন কাছীর, তাফসীরে-ইবন কাছীর, সংস্করণ বিহীণ, (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৪০১হি), ২২৭/১। ইবনে আব্বাস, উমর ইবন আবদুল আযীয, মুকাতিল প্রমুখ হতে এই তাফসীর বর্ণিত হয়েছে।

১৩৯ আল-আ'রাফ: ২৯।

১৪০ দ্রষ্টব্য, সারাখসী, শারহু কিতাবিস সিয়ারিল কাবীর, ৪/১৮৬।

১৪১ দ্রষ্টব্য, সারাখসী, শারহু কিতাবিস সিয়ারিল কাবীর, ৪/১৮৬।

১৪২ দ্রষ্টব্য, ইমাম মালিক, আল-মুদায়ানাহ, সম্পাদনাঃ সাইয়্যিদ আলী ইবন সাইয়্যেদ আবদুর রহমান আল হাশিম, (সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রধান শায়খ যায়েদ এর অর্থায়নে ১৪২২হিজরীতে প্রকাশিত), ৩/১৩।

প্রদান কিংবা আচরণের মাধ্যমে যুদ্ধে অংশ নেয় না তাদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করে। তারাও বেসামরিক নাগরিকদের মত, ইসলাম যুদ্ধের সময় যাদের অধিকারগুলো সুরক্ষিত রেখেছে। সুতরাং, কোনো মুসলিম দলনেতা কিংবা সৈন্যদলের উচিত হবে না শত্রুপক্ষের মধ্য থেকে যারা বেসামরিক তাদেরকে যুদ্ধে শামিল করা। তাছাড়া এই নিষেধাজ্ঞা অনুযায়ী উপাসনালয়, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিন্দুমাত্র আঘাত হানা যাবে না। সাহাবীগণ রা. এই নিষেধাজ্ঞা মেনে যুদ্ধ করেছিলেন। যখন তাঁরা সিরিয়া বিজয় করেছিলেন তখন তারা কোনো উপাসনালয় ও গীর্জায় আঘাত হানেন নি। গীর্জার লোকদের নিজেদের মত থাকতে দিয়েছেন। যুদ্ধকালীন উভয় পক্ষের সশস্ত্র সংঘর্ষ কিংবা তৎপরবর্তীকালে এদের সাথে কোনোরূপ খারাপ আচরণ করা হয় নি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের প্রায়োগিক দিক

(মডেল হিসেবে বদর যুদ্ধ)

যুদ্ধ কিংবা শান্তি উভয় অবস্থায় ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাঙ্খিত নিয়মনীতি প্রণয়ন করা কঠিন কোন কাজ নয়। সত্যিকার অর্থে কঠিন হলো এসব নীতিমালার বাস্তবায়ন, নীতিমালার বিষয়বস্তু ও চেতনাকে সত্যিকারভাবে কর্ম ও আচরণে কার্যকর করা, বিশেষত যুদ্ধকালীন অবস্থায়। যখন মানুষ সুন্দর সুন্দর আইন ও প্রশংসিত মূল্যবোধের কথা বেমালুম ভুলে যায় এবং বিজয়ীর আইনই সব নিয়ন্ত্রণ করে। এমতাবস্থায় বিজয়ীর দাপটে বিজিতের অবস্থা সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে।

এ কারণেই আমি মনে করি এখানে ইসলামের আন্তর্জাতিক মানবিক আইন সম্পর্কে মূলনীতি বা দর্শন আলোচনা করাই যথেষ্ট নয়, বরং আমি ইতিপূর্বে আলোচিত বক্তব্যের ব্যবহারিক মডেল উল্লেখ করতে চাই। আর তা হবে একটি বাস্তব সামরিক যুদ্ধের মাঠপর্যায়ের গবেষণার মাধ্যমে, যেখানে মুসলমানগণ তাদের শত্রুদের সাথে প্রচন্ড যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে বিজয় লাভ করেছে এবং শত্রুদের শোচনীয় পরাজয় ঘটেছে। এ রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের পর আসুন আমরা প্রশ্ন করি!! যুদ্ধের ময়দান সম্পর্কে ইতোপূর্বে উল্লেখিত দর্শন কি ছিলো? প্রশ্নটি আমি করলাম, এরপর এর জবাব দিবো যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সা. এর মানবিক আচরণের কিছু প্রাণবন্ত ও বাস্তব উদাহরণ দিয়ে।

এই জবাবটিতে ইসলামে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন বাস্তবে প্রয়োগের মানদন্ড সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সা. বিভিন্ন যুদ্ধে মানবিক আইনসমূহ কার্যত যা বাস্তবায়ন করেছেন তা সম্পর্কে। আর বদর যুদ্ধকে এখানে মডেল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু বদর যুদ্ধ সম্পর্কে কথা বলার আগে আমি নিজ থেকেই অগ্রিম একটি প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাই যা পাঠকদের পক্ষ উত্থাপিত হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। অতঃপর আমি এর জবাব দেবো। আর তা হলো কেন আমি বদর যুদ্ধকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করছি? বদর যুদ্ধকে নির্বাচন করার কারণগুলো হলো:

১. বদর যুদ্ধ হলো রাসূলুল্লাহ সা. ও কুরাইশ কাফিরদের মধ্যকার সর্বপ্রথম মুখোমুখি সামরিক সংঘর্ষ। পাশাপাশি এটি আন্তর্জাতিক ইসলামি মানবিক আইনেরও সর্বপ্রথম প্রায়োগিক পরীক্ষা এবং দীর্ঘকাল তাত্ত্বিক ময়দানে অবস্থানের পর প্রথম বাস্তব ময়দানে সংর্ঘষের অভিজ্ঞতা।

২. মক্কার কাফিরদের পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ সা. তাঁর সাহাবীদের সাথে মারাত্মক শত্রুতা পোষণ ও অকথ্য নির্যাতনের পর বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। সুতরাং স্বভাবতই প্রত্যাশিত ছিল, বিজিতের উপর বিজয়ী দলের নির্যাতন ও প্রতিশোধের মাত্রা পূর্ববর্তীদের তুলনায় অনেকগুন বৃদ্ধি পাওয়া। কারণ তাদের কাছ থেকে বিজয়ী দল অতীতে যুলুমের-নির্যাতনের মাধ্যমে অধিকার হরনের চূড়ান্ত মাত্রায় উপনীত হয়েছিলেন।

৩. রাসূলুল্লাহ সা. এ যুদ্ধে শত্রুদের উপর সুস্পষ্ট বিজয় অর্জন করেছিলেন।

৪. বিজয় লাভের পর রাসূলুল্লাহ সা. শত্রু পক্ষের বিরাট সংখ্যককে যুদ্ধবন্দী হিসেবে আটকও করেছিলেন। সম্ভবত সংঘটিত যুদ্ধটির একটি চিত্র তুলে ধরলে বিষয়টি সম্পর্কে আরো পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে।

রাসূলুল্লাহ সা. মক্কায় নবুওয়তপ্রাপ্ত হয়ে মহান আল্লাহ ও তাঁর তাওহীদের দিকে আহ্বান করতে থাকেন। তিনি মানুষকে খারাপ চরিত্র, মন্দ কাজ, অশ্লীলতা এবং শিরক থেকে বিরত থাকতেও আহ্বান জানান। এর ফলশ্রুতিতে অনেক কুরাইশ নেতার পক্ষ থেকে তিনি মৌখিক অতঃপর দৈহিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। অতঃপর সাহাবীদের মধ্যে যারা তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করেছেন তাদের উপরও তারা কঠিন নির্যাতন চালায়। এতে তাঁর সাহবীদের কেউ কেউ মৃত্যু বরণ করেছেন। ফলে কিছুসংখ্যক সাহাবী নিরাপদে দ্বীনের বিধি-বিধান পালন ও ধর্মীয় স্বাধীনতার আশায় হাবশায় হিজরত করতে বাধ্য হয়েছেন। নির্যাতন অব্যাহত থাকায় সাহাবীদের আরেকটি দলও তাদের অনুসরণ করে হাবশায় হিজরত করেন। এরপরও রাসূলুল্লাহ সা. ও তাঁর সাহাবীদের উপর অত্যাচার চলতেই থাকায় নবী সা. তাঁর সাহাবীদেরকে মদীনায় হিজরত করার অনুমতি দেন এবং তিনি নিজেও অন্ধকার রাত্রে আবু বকর রা. নিয়ে মদীনায় হিজরত করেন। তাঁরা তাদের প্রিয় মাতৃভূমি ও ধন-সম্পদ ফেলে চলে যান, যা কাফিরদের লুঠের মালে পরিণত হয়েছিল।

রাসূলুল্লাহ সা. এর হিজরাতের সংবাদ পেয়ে কাফিররা তাঁকে ধাওয়া করলো এবং যে তাঁকে জীবিত অথবা মৃত উপস্থিত করতে পারবে তার জন্য মূল্যবান পুরষ্কারও ঘোষণা করলো। তারা যখন জানতে পারলো তিনি নিরাপদে মদীনায় পৌঁছে গেছেন, তাতেও তারা ক্ষন্ত হয়নি। বরং তাঁর সাথে সংঘাত অব্যাহত রাখে। হিজরতের দুই বছর পর মক্কা ও মদীনার প্রায় মধ্যখানে বদর যুদ্ধ সংঘটনের আগে তাদরে মাঝে বিচ্ছিন্ন আকারে সামরিক সংঘাত অব্যাহত থাকে। এ যুদ্ধে কাফিরদের সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার (১,০০০) এবং মুসলিমদের সংখ্যা ছিল মাত্র তিন শত চৌদ্দ (৩১৪) জন। এই যুদ্ধে সত্তর জন নিহত ও সত্তর জন বন্দী হওয়ার মাধ্যমে কাফিরদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে।

বদর যুদ্ধে মানবিক অবস্থানসমূহ

বদর যুদ্ধের এই সংক্ষিপ্ত প্রেক্ষাপট উল্লেখ করার পর আমি এখানে এমন দুটি বিষয় আলোচনা করতে চাই যা অন্যান্য মানবিক দিককে অন্তর্ভুক্ত করে। প্রথম বিষয়টি নিজ সৈনিকদের সাথে রাসূলুল্লাহ সা. এর আচরণের সাথে সম্পর্কিত, আর দ্বিতীয়টি যুদ্ধবন্দীদের সাথে সম্পৃক্ত। পাঠকদেরকে কষ্ট না দেওয়ার জন্যই আমি অন্যান্য দিকগুলো বাদ দিয়েছি। তাছাড়া মডেল হিসেবে এটুকু আলোচনাই যথেষ্ট। যেমন:

প্রথমত: নিজ সৈনিকদের সাথে রাসূল সা. এর আচরণের মানবিক দিকসমূহ:

১. রাসূলুল্লাহ সা. সৈন্যদের সাথে এমনভাবে আচরণ করতেন যেন তিনি তাদেরই একজন এবং তাদের ও তাঁর মাঝে কোনো পাথর্ক্য নেই। বদর যুদ্ধে এর বাস্তব উদাহরণ রয়েছে। এ যুদ্ধে দু'টি ঘোড়া ও সত্তরটি উট নিয়ে তিন শতাধিক সৈন্য রওয়ানা দিয়েছে। ফলে এগুলোতে তাদের পালাক্রমে আরোহণ করতে হয়েছে। বাহন স্বল্পতার কারণে একজন আরোহণ করে একটু পর নেমে যেতেন, এরপর আরেকজন আরোহণ করতেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সা. আলী ইবনে আবী তালিব ও মারছাদ ইবনে আবি মারছাদ আল- গানুবীর সাথে মাত্র একটি উটে পালাক্রমে আরোহণ করেছেন।[১৪৩]

১৪৩ ইবনুল কাইয়্যিম, যাদুল মা'আদ, ৩/১৭১।

এমতাবস্থায় তারা দু'জনে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সা.! আমরা উভয়ে হেঁটে যাই, কেবল আপনি আরোহণ করুন। এ কথা শুনে তিনি বললেন, "তোমরা আমার চেয়ে বেশি শক্তিশালী নও, আর প্রতিদানের দিক থেকেও আমি তোমদের দু'জনের তুলনায় বেশি অভাবমুক্ত নই"।[১৪৪] অথচ ঐ সময় তাঁর বয়স ছিল ৫৫ বছর আর আলী রা. এর বয়স ছিল ২৫ বছর। এতদসত্ত্বেও তাঁরা মাত্র একটি উটে পালাক্রমে আরোহণ করেছিলেন। নিশ্চয়ই মানবাধিকারের প্রতি সেনাপ্রধানের শ্রদ্ধাবোধ তাঁর সহযোদ্ধাদের প্রতি নম্র আচারণের মধ্য দিয়েই সূচীত হয়। আর মানবাধিকারের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘনের বীজ প্রতারণামূলকভাবে ব্যক্তি চিন্তা-চেতনায় ও সাধারণ সৈনিকের তুলনায় নিজেকে বড় মনে করার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে। ফলে সে তাদের উপর যুলম করে এবং মর্যাদাহানি ঘটায়। সৈন্যটি তার প্রধানের কাছ থেকে যে অত্যাচারের শিকার হয়েছে তা প্রয়োগ করার জন্য সে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে কখন শত্রুপক্ষের সৈন্য তার হস্তগত হবে। সেনাপ্রধানের নম্র আচরণ মানবাধিকারের প্রতি তার পরিপূর্ণ শ্রদ্ধাবোধের প্রমাণ। কোনো সেনাপ্রধান যদি সৈনিকদের অন্তরে মানুষের জীবনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাদের সাথে নম্র আচরণ করেন, তাদের অধিকারের প্রতি সম্মান দেখান, তাহলে শত্রুপক্ষের মানুষের সাথে এই সৈনিকের আচরণেও তা প্রতিফলিত হবে।

২. বদর যুদ্ধে অন্যের মতামতকে সম্মান দেওয়া ও পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূলনীতিটি পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। রাসূলুল্লাহ সা. তাঁর সাহাবীদের বলেছেন, "হে জনমন্ডলী! তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও।" তিনি মুহাজির, আনসার (খাজরাজ ও আওস গোত্রের) এবং হাব্বাব ইবনুল মুনযিরসহ অনেকের সাথেই এ বিষয়ে কথা বলেছেন। নবী সা. তাঁর সৈন্যদের প্রস্তাবনার আলোকে সামরিক কৌশলে পরিবর্তনও এনেছেন। নবী করিম সা. তাঁর সাথে যারা ছিলেন তাঁদেরকে নিজের মানবিক চিন্তা-চেতনা ও মতামত প্রদানের বিষয়টি অনুভব করতে দিতেন এবং তাদেরকে উৎসাহিত করতেন যাতে নিজেদেরকে তুচ্ছ মনে না করে এবং তাঁরা যাতে মনে করে এ যুদ্ধে বুদ্ধি

১৪৪ হাদিসটি হাকিম তার মুসতাদরাক গ্রন্থে উদ্ধৃত করে বলেন এটি সহীহ। ইমাম যাহবীও এর সাথে একমত পোষন করেন ৩/২০, দ্রষ্টব্য, যাদুল মা'আদের টীকা, ৩/১৭১।

পরামর্শ কিংবা দৈহিক শক্তি দিয়ে হলেও তাদের অবদান রয়েছে। আধুনিক যুগের সেনাবাহিনীতে এরূপ দৃষ্টান্ত খুবই বিরল।

বর্তমানে সেনাপ্রধানগণ সাধারণ সৈনিকদের কথা আমলে নেওয়াতো দূরের কথা বরং তাদের কথা বলার সুযোগই দেয় না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সা. তাঁর সাথীদের মতামত চাইতেন, তাদের কথা শুনতেন, তাদের মতামতকে সম্মান দিয়ে নিজের রাজনৈতিক কৌশলে পরিবর্তন আনতেন। এতে অপরপক্ষ মনে করতো নিশ্চয় তার মতামতের মর্যাদা রয়েছে, যা শুনা হয় এবং তার প্রভাব রয়েছে।

মতামতের স্বাধীনতা বলতে নিছক কথা বলার সুযোগই বুঝায় না, বরং মতামতের স্বাধীনতা হলো কেউ আপনার কথা শুনবে, আপনার মতকে সম্মান দিবে এবং তাতে প্রভাবিত হবে।[১৪৫] যুদ্ধরত কোনো সেনাবাহিনী যদি এসব প্রশিক্ষণ ও গুণাবলীর উপর গড়ে উঠে এবং ভিন্নমতকে সম্মান করতে ও অন্যের মতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের নীতিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠে তবে আপনি সর্বদাই দেখবেন এই মূলনীতি মেনে চলতে, অন্যকে তার অধিকার বুঝিয়ে দিতে, তারা অন্যের উপর সীমালঙ্ঘন করবে না। যদিও সে তাদের মত ও নীতির বিরোধী হয়।

৩. বদর যুদ্ধে সৈনিকদের সারি সোজা করার সময় আরেকটি চমৎকার দিক ফুটে উঠেছে, যাতে দেখা যায় রাসুলুল্লাহ সা. তাঁর সৈন্যকে সন্তুষ্ট রাখা, ন্যায় নীতি বাস্তবায়ন, নিজের বিপক্ষে গেলেও সত্য প্রতিষ্ঠা করা এবং সেনাপ্রধানের কাছ থেকে একজন সাধারণ সৈনিককে কিসাস তথা প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ দিতে কতটা ব্যাকুল ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সা. সাওয়াদ ইবন গাযিয়া রা. এর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন তিনি লাইনের বাইরে আছেন। ফলে তিনি তাকে গাছের ডাল দিয়ে পেটে মৃদু আঘাত করে বললেন, হে সাওয়াদ সোজা করে দাঁড়াও! এরপর সাওয়াদ বললো, হে আল্লাহর রাসূল সা.! আপনি আমাকে ব্যাথা দিলেন? অথচ আল্লাহ আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন। সুতরাং আপনার কাছ থেকে আমাকে প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ দিন। তখন রাসূলুল্লাহ সা. তার পেট উন্মুক্ত করে দিয়ে বললেন, প্রতিশোধ নাও। তৎক্ষনাৎ সাওয়াদ তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন এবং তাঁর পেটে চুমু খেলেন। অতঃপর রাসূল সা.

১৪৫ দ্রষ্টব্য, মুহাম্মদ তাহের ইবন আশূর, মাকাসিদুশ শরীয়াহ আল-ইসলামিয়্যা, পৃ. ১২৮।

বললেন, তুমি এটা কেন করলে সাওয়াদ? জবাবে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সা.! আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটি মৃত্যু ও শাহাদাতের জায়গা। তাই আমি চেয়েছি আপনার চামড়ার সাথে আমার চামড়া স্পর্শ করার মাধ্যমে আমার সর্বশেষ সময় আপনার সাথে কাটুক। এরপর রাসূল সা. তাঁর কল্যাণের জন্য দু'আ করলেন।১৪৬

তিনি এমন এক ব্যক্তিত্ব যিনি তাঁর একজন সাধারণ সৈনিকের পক্ষ থেকে আজব একটি দাবী মেনে নিলেন এবং স্বয়ং নিজের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ করে দিলেন। সুতরাং আপনি তাকে কখনো মানবাধিকারের পরিপন্থী একটি কাজও করতে দেখবেন না, চাই সেটি তাঁর সৈন্যদের সাথে বা শত্রুদের সাথে হোক। অন্যদিকে যেই সৈন্যটি নিজ চোখে ন্যায়কে সমুন্নত রাখার স্বার্থে স্বীয় নেতার কাছ থেকে বাস্তবে এরূপ মূল্যায়ন দেখতে পেল আপনি তাকেও কখনো এক মুহূর্তের জন্যও বিজয় উল্লাসের সময় মানবাধিকার লঙ্ঘন করতে দেখবেন না।

দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধবন্দীদের সাথে রাসূলের সা. আচরণ সংশ্লিষ্ট মানবিক দিকসমূহ:

১. বদর যুদ্ধে রাসূল সা. সত্তরজনকে বন্দী করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তারা শুধু বন্দী ছিলো না, বরং আধুনিক যুগের পরিভাষায় তারা ছিলো রীতিমত যুদ্ধাপরাধী।১৪৭ কারণ, তারা যুদ্ধের আগে রাসূলকে সা. অনেক কষ্ট দিয়েছিলো, তাঁকে হত্যার চেষ্টা করেছিলো, তাঁকে নিজ এলাকা থেকে বিতাড়িত করেছিলো এবং রাসূলের সা. দাওয়াতে সাড়া দেওয়ার কারণে তাঁর অনেক সাহাবীকে রা. নির্মমভাবে নির্যাতন করেছিলো যার কারণে অনেকেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এরপরেও রাসূল সা. তাদেরকে বন্দী করার পর সত্তরজন থেকে বিশেষ আচরণের কারণে মাত্র দুজনকে হত্যা করেছিলেন। আর তা হলো, তারা দুজন যুদ্ধের আগে রাসূলের সা. সাথে অতিমাত্রায় খারাপ আচরণ করেছিলো।

২. রাসূল সা. যুদ্ধবন্দীদের বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাদেরকে সাহাবীদের রা. কাছে অর্পণ করে তাদের সাথে সদাচরণ করতে বলেছেন। এক্ষেত্রে

১৪৬ ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ, ২/২৬৬-২৬৭। ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, ৩/১৪৮।

১৪৭ দ্রষ্টব্য, মুহাম্মদ আল-গাজালী, ফিকহুস সীরাহ, পৃ. ২৩৭।

তিনি যে উপদেশগুলো দিয়েছেন তা যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে একটি সামষ্টিক মূলনীতিকে ধারণ করে। যা সন্দেহাতীতভাবে সব ধরনের কল্যাণময় ব্যাপারগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে। অর্থাৎ, থাকা, খাওয়া ও আচরণের ক্ষেত্রে তাদের সাথে সদাচরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে যে কোনো ত্রুটি মূলত রাসূলের সা. উপদেশ পালনে ত্রুটি সাধনের মত।

সাহাবীগণ রা. যাতে যুদ্ধবন্দীদের গুরুত্ব দেয় সেজন্য রাসূল সা. সাহাবীদের মাঝে তাদেরকে বন্টন করে দিতেন। ইমাম বায়দাভী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে বলেন: "যখন কোনো বন্দীকে রাসূলের সা. কাছে আনা হতো তখন তিনি মুসলিমদের মধ্যে কোনো একজনের কাছে পাঠিয়ে দিতেন এবং তাকে বলতেন, "তার সাথে সদাচরণ করো"।[১৪৮]

তার মানে এই যুদ্ধবন্দীরা সাহাবীদের রা. সাথে তাঁদের ঘরে থাকতো।[১৪৯] আবার কখনো তারা মসজিদেও অবস্থান করতো। এদের ব্যাপারে ইতিহাস থেকে কিছু ঘটনা নিচে দেওয়া হলোঃ-

এক, আবু আযিয ইবন উমাইর নামে এক বন্দী বলছেঃ "তারা যখন বদর থেকে আমাকে বন্দী করে নিয়ে আসে তখন আমি একদল আনসারের সাথে ছিলাম। যখন তারা দুপুরের অথবা রাতের খাবার আনতো আমাকে বিশেষভাবে রুটি দিতো (যা তৎকালীন শ্রেষ্ঠ খাবার ছিলো)। আর তাঁরা খেজুর খেতো। কারণ রাসূল সা. তাদেরকে আমাদের সাথে ভালো আচরণ করার উপদেশ দিয়েছিলেন। তাদের কাছে কোনো রুটির টুকরো আসলেই তা আমাকে দিয়ে দিতো। আমি লজ্জা পেয়ে তা ফেরত দিয়ে দিলে তারা তা গ্রহণ না করে আবার আমায় দিয়ে দিতো"।[১৫০]

দুই, আবুল আ'স ইবনুর রবী' নামক এক বন্দী বলছে, "আমি একদল আনসারের (আল্লাহ তাঁদের উত্তম প্রতিদান দিক) সাথে ছিলাম। আমরা যখন দুপুরের অথবা রাতের খাবার খেতাম তখন তাঁরা নিজেরা খেজুর খেয়ে আমাকে রুটি দিয়ে প্রাধান্য দিতো। অথচ তাদের কাছে রুটি কম

---

১৪৮ বায়দাভী, তাফসীর আল-বায়দাভী মুহিউদ্দিন এর টীকা-টীপ্পনীসহ প্রকাশিত), ৪/৫৮৮-৫৮৯।

১৪৯ দ্রষ্টব্য, আশ-শামী, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪/৯৯-১০০। উম্মুল মু'মিনীন সাওদা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি সুহাইল ইবন আমরকে একদা বাড়িতে দেখেছেন, যিনি ছিলেন বদরের একজন যুদ্ধবন্দী, দ্রষ্টব্য আল-ওয়াকিদী, আল-মাগাযী ১/১১৮।

১৫০ ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ, ২/২৮৮। আল-যুরকানীও শারহুল মাওয়াহিব গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হাফিজ হাইছামী বলেন, এর সনদ হাসান।

থাকতো আর খেজুর থাকতো বেশি। এমনকি কারো কাছে রুটি আসলেই তা আমাকে দিয়ে দিতো" ।১৫১

তিন, ওয়ালীদ ইবন ওয়ালীদ ইবন মুগীরাহও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। বরং তিনি আরেকটু বাড়িয়ে বলছেন: "তাঁরা (সাহাবীগন রা.) আমাদেরকে বাহনে করে নিয়ে যেতেন আর তাঁরা নিজেরা হেঁটে যেতেন।"১৫২ অর্থাৎ, বন্দীরা বাহনে চড়ে আসতো আর সাহাবীগণ পায়ে হেঁটে আসতেন।

এই বন্দীর জবানবন্দি থেকে যে বিষয়টি ফুটে উঠে সেটি হলো, সাহাবীগণ রা. যুদ্ধবন্দীদের ভালো খাবার দিয়ে প্রাধান্য দিতেন। তাঁরা বন্দীদের সাথে শুধু খাবারের ক্ষেত্রে সমান ছিলেন তেমন না। বরং তাদেরকে তাঁরা সবচেয়ে ভালো খাবার দিয়ে আপ্যায়ন করাতেন। আর নিচু মানের খাবারগুলো তাঁদের জন্য রেখে দিতেন। তাছাড়া বন্দীরা বাহনে চড়ে যেতো আর সাহাবীগণ পায়ে হেঁটে যেতেন। প্রাচীন যুগ আর আধুনিক যুগের যুদ্ধের ইতিহাস যারা অধ্যয়ন করে তাদের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত বিষয়টিকে বিশ্বাস করা অসম্ভব। কারণ তারা জানে সেই যুদ্ধগুলোতে মানুষের ন্যুনতম অধিকারগুলোও কিভাবে খর্ব করা হতো, কিভাবে তার রক্তপাত হতো আর তার সম্মান হরণের মাধ্যমে সে কিভাবে অধিকার বঞ্চিত হতো। তাছাড়া সেখানে এমন কাউকে পাওয়া যেতো না যে খাবার দিয়ে আপ্যায়ন করবে আর আশ্রয় প্রদান করবে। তাহলে ওদের ব্যাপারে তাদের কি ধারণা জন্মাবে যারা খাবার আর বাহন দিয়ে বন্দীদের নিজেদের উপর প্রাধান্য দিতো?

৩. আব্দুর রায্যাক বন্দীদের প্রতি অনুগ্রহের একটি ঘটনা উল্লেখ করে বলেনঃ "বদরের দিন যখন আব্বাসকে রা. বন্দী করা হলো তখন রশিতে শক্ত করে বাঁধার কারণে তাঁর ক্রন্দন রাসূলের সা. কানে এসে পৌঁছালো। সেদিন রাতে রাসূলের সা. চোখে ঘুম আসছিলো না। তখন আনসার থেকে এক লোক এসে রাসূলকে সা. বললেন: "আপনি রাত থেকেই নির্ঘুম আছেন"। তখন তিনি সা. বলেন: "আব্বাসের রা. কষ্টই আমাকে অনিদ্রায় রেখেছে"। তখন ঐ ব্যক্তিটি বললেনঃ "আমি কি গিয়ে আব্বাসের রা. কষ্টটা হালকা করে দিবো না? রাসূল সা. বলেন: "আমি

১৫১ আল-ওয়াকেদী, আল-মাগাযী ১/১১৯।

১৫২ আল-ওয়াকেদী, প্রাগুক্ত।

পারলে নিজে গিয়েই কাজটি করতাম"। তখন ঐ আনসারী গিয়ে আব্বাসের রা. রশির গীটটা হালকা করে দিলে রাসূল সা. শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েন।[১৫৩] এটি ছিলো বন্দীদের প্রতি একজন সেনাপতির অনুগ্রহ। আর বর্তমানে যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে এভাবে চিন্তা করার মত কাউকে পাওয়া যায় না। সেনাপতি তো দূরের কথা সাধারণ সৈনিকদের পক্ষ থেকেও এ রকম অনুগ্রহ আশা করা যায় না ।

৪. বদর যুদ্ধে বন্দিদের সাথে মানবিক আচরণের আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো, যুদ্ধবন্দীদের মেয়েদের প্রতি রাসূলের সা. দয়া ও অনুগ্রহ। এমনকি রাসূল সা. কিছু না নিয়ে এক যুদ্ধবন্দীকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন কেবল তার মেয়েদের প্রতি অনুগ্রহ করে। ওয়াকিদী র. তাঁর সনদে সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ "বদরের দিন রাসূল সা. বন্দীদের মধ্য থেকে আবু ইজ্জাহ আমর ইবন আবদুল্লাহ ইবন উমাইর আল-জামহীকে (তৎকালীন কবি) মুক্ত করে দিয়েছিলেন যখন সে রাসূলকে সা. বলেছিলো, "আমার পাঁচজন মেয়ে আছে যাদের কিছু নেই। হে মুহাম্মাদ! আমাকে মুক্ত করে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করো" ।[১৫৪]

৫. সুহাইল বিন আমর ছিলো কুরাইশ বংশের একজন প্রভাবশালী নেতা। যখন সে কুরাইশের কাফেলাকে আটকাতে রাসূলের সা. আগমনের বিষয়ে অবগত হলো, তখন সে রাসূলের সা. মোকাবিলা করতে সবাইকে ঝাঁপিড়ে পড়ার জন্য উৎসাহিত করেছিলো। পরে যখন বদর প্রান্তরে দু'দল যুদ্ধে লিপ্ত হয় তখন সে বন্দী হয়ে যায়। তখন উমর ইবন খাত্তাব রা. রাসূলকে সা. বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমি তার সম্মুখ দাঁতগুলো তুলে ফেলি যাতে করে সে আর কখনো আপনার বিরুদ্ধে বক্তব্য দিতে না পারে"। তখন রাসূল সা. বললেন: "আমি অঙ্গচ্ছেদ করবো না। যেন আল্লাহ আমার সাথে অবুরূপ আচরণ না করেন। যদিও আমি নবী (হিসেবে তিনি আমার সাথে অমনটা করবেন না)। হয়তো একদিন তার অবস্থান এমন হবে যা তোমার অপছন্দ হবে না।"[১৫৫]

রাসূলের সা. মতো এভাবে রহমতের দৃষ্টান্ত বর্তমানে কিংবা এর আগে কোনো সেনাপতি দেখাতে পারে নি। সেনাপতিরা বিজয়ের পর প্রথম যে

---

১৫৩ আব্দুর রাজ্জাক, আল-মুসান্নাফ ৫/৩৫৩।

১৫৪ আল-ওয়াকেদী, আল-মাগাযী ১/১১০-১১১।

১৫৫ আল-ওয়াকেদী, আল-মাগাযী ১/১০৭। আশ-শামী, সুবুলুল হুদা ৪/১০৭।

কাজটির দিকে অগ্রসর হয় সেটি হলো প্রতিশোধ। বিশেষ করে যারা মনে চরম শত্রুতা পোষণ করে। কিন্তু রাসূলের সা. কাজে এটি পাওয়া যায় নি। তিনি বাস্তবিকভাবে বুঝিয়েছেন যে, শত্রুর সাথে শত্রুতা যতই হোক না কেনো সেও একজন মানুষ যার কিছু অধিকার আছে। এক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করা যাবে না। সুতরাং শত্রুকে কোনো কষ্ট দেওয়া যাবে না এবং তার উপর নির্যাতন করাও যাবে না। বরং শত্রু যদি প্রতিপক্ষের সেনাপতিও হয় যে বন্দী হওয়ার আগেও মুসলমানদের প্রতি চরম শত্রুতা প্রকাশ করতো সেও মানবিক মর্যাদার বিবেচনায় সম্মান পাওয়ার যোগ্য।

মানবিক মর্যাদার উপর ভিত্তি করে ফকীহগণ শত্রু পক্ষের কারো অঙ্গচ্ছেদ করাকে নিষেধ করেন।[১৫৬] ইমাম যামাখশারী র. বলেছেনঃ "অঙ্গচ্ছেদ হারাম হওয়াতে কোনো মতানৈক্য নেই। হাদিসে হিংস্র কুকুরকেও অঙ্গচ্ছেদ করার নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত আছে।"[১৫৭]

৬. যুদ্ধবন্দীদের প্রতি রাসূল সা. ও মুসলিমদের গুরুত্ব দেওয়াটা শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। বরং আমরা দেখি, রাসূল সা. বন্দীর কাপড়ের প্রতিও গুরুত্ব দিয়েছেন। সহীহ বুখারীতে এসেছে, জাবির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "বদরের দিন আব্বাসকে রা. নিয়ে আসা হলো। তখন তাঁর গায়ে কাপড় ছিলো না। রাসূল সা. তখন আব্বাসের রা. জন্য একটি পোষাক খুঁজতে লাগলেন। পরে আবদুল্লাহ ইবন উবাই'র কাছে রাসূলুল্লাহ সা. এর জন্য যে পোশাকটি সুনির্দিষ্ট করেন সেটি পাওয়া গেলো। তখন রাসূল সা. এই পোষাকটি আব্বাসকে রা. পরিয়ে দিলেন"।[১৫৮] অন্য হাদিসে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সা. কিছু বন্দীকে নিজের কাপড় পরতে দিয়েছিলেন।[১৫৯]

---

১৫৬ শাফিঈ, আল-উম্ম, ৪/২৪৫।

১৫৭ যামাখশারী, আল কাশশাফ আন হাকায়িকিত তানযিল... সম্পদনা: মুহাম্মদ সাদিক কামহাবী (মিসর: মাকতাবাতু মুস্তফা আল-বাবী আল-হালবী, ১৩৯২ হি.), ২/৪৩৫।

১৫৮ বুখারী, ইবনু হাজার প্রণীথ ফাতহুল বারীসহ প্রকাশিত সহীহ আল-বুখারী ৬/১৪৪, হাদিস নং ৩০০৮। বলা হয়ে থাকে ঠিক এ কারণেই রাসূল সা. মুনাফিকদের সরদার আবদুল্লাহ ইবন উবাই'র মৃত্যুর দিন তাকে নিজের জামা দান করেছিলেন।

১৫৯ দ্রষ্টব্য, সালেহ আশ-শাছরী, হুকুকুল অছরা ফিল ইসলাম (ইন্টারনেটে আল-ইসলাম ওয়েবসাইটে প্রকাশিত গবেষণা), পৃ. ৭।

৭. বন্দীদের সাথে মানবিক আচরণের আরো একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করতে গিয়ে আল-ওয়াকেদী উল্লেখ করেন, খালিদ ইবন হিশাম ইবন মুগীরাহ ও উমাইয়াহ ইবন আবু হুযাইফা ইবন মুগীরাহ বন্দী অবস্থায় উম্মে সালমা রা. এর ঘরে প্রবেশ করলো। এরা ছিল তাঁর আত্মীয়।১৬০ এটা জানার পর তিনি রাসূলকে সা. খুঁজতে গেলেন। তাঁকে আয়িশার রা. ঘরে পাওয়ার পর তাঁকে বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল সা.! আমার চাচার গোষ্ঠী আবেদন করেছে যে আমি যেন তাদেরকে আমার ঘরে ঢুকতে দিয়ে তাদের আপ্যায়ন করি, তাদের এলোমেলো চুলগুলো ঠিক করে তা তেল দিয়ে আঁচড়ে দেই। আর আমি আপনার অনুমতি না নিয়ে তা করতে চাই না"। তখন রাসূল সা. বললেনঃ "আমি এর কোনোটিই অপছন্দ করি না। তোমার যেটা ভালো লাগে সেটা করো"।১৬১

বন্দীদের সাথে এমন মর্যাদাপূর্ণ অতিথিসূলভ আচরণ সত্যিই অবাক করার মতো! চুল ঠিক করে তা আবার তেল দিয়ে আঁচড়ে দেওয়ার মত যুদ্ধবন্দীদের সাথে এমন মানবিক আচরণ কেউ কি কোনো যুদ্ধে আদৌ দেখাতে পেরেছে?

৮. বন্দীদের নিয়ে রাসূল সা. মদিনায় পৌঁছার পর শত্রু সৈনিকের সাথে তাঁর মানবিক আচরণের আরো একটি উদাহরণ আমরা দেখতে পাই। তিনি প্রত্যেক যুদ্ধবন্দীর সক্ষমতা ও সম্ভাবনাকে বিবেচনা করেছেন। যুদ্ধবন্দীদের মধ্য থেকে যারা সহায় সম্পদহীন গরিব ছিলো তাদেরকে মুক্তিপন ব্যতীত মুক্ত করে দিয়েছেন।১৬২ মুক্তদের মধ্যে এমনও ছিলো যাদের বাবা ইসলাম গ্রহণ করায় তাদের সম্মানার্থে তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাদের অন্যতম হলো ওয়াহাব ইবন উমাইর আল-জামহী।১৬৩ ইবনে কাছীর র. উল্লেখ করেছেন যে, রাসুল সা. অনেক যুদ্ধবন্দীকে মুক্তিপন ব্যতীত ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে আবুল আ'স ইবন রাবি আল-উমাভী, মুত্তালিব ইবন হানতাব আল-মাখযূমী ও সায়ফী ইবন আবু রিফাআহ উল্লেখযোগ্য।১৬৪

১৬০ দ্রষ্টব্য, আশ-শামী, সূবুলুল হদা ওয়ার রাশাদ, ৪/১১৮।

১৬১ আল-ওয়াকেদী, আল-মাগাযী ১/১১৮-১১৯।

১৬২ আল-ওয়াকেদী, আল-মাগাযী ১/১২৯, ১৩৮।

১৬৩ আল-ওয়াকেদী, আল-মাগাযী ১/১২৭।

১৬৪ দ্রষ্টব্য, ইবনু কাছীর, আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৩/৩২৮।

অনুরূপভাবে যুদ্ধবন্দীদের কেউ কেউ ভালো পড়ালেখা জানতো। রাসূল সা. তাদের প্রত্যেককেই দশজন মুসলিম সন্তানের পড়ালেখা শেখানোর বিনিময়ে তাদের মুক্তিপন নির্ধারণ করেছিলেন।১৬৫ এর মাধ্যমে বন্দীর প্রতি তাঁর সম্মান ও মানবিকতাকে সমুন্নত করার বিষয়টি ফুটে উঠে। সে বন্দী হলেও এক্ষেত্রে সে একজন সম্মানীত ও মর্যাদাবান শিক্ষক। অন্যদিকে এর মাধ্যমে ইসলাম যে জ্ঞানকে ও মানুষের মাঝে জ্ঞানের প্রচার-প্রসার ঘটানোর প্রয়াসকে কতটুকু গুরুত্ব দেয় সেটিও প্রতিভাত হয়।

আর যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে যাদের অবস্থা স্বচ্ছল ছিলো এবং যারা সামর্থ্যবান ছিল তাদের কাছ থেকে রাসূল সা. মুক্তিপণ আদায় করেছিলেন। বরং আমরা দেখতে পাই, রাসূল সা. স্বয়ং নিজেই তাঁর চাচা আব্বসের রা. কাছ থেকে অন্য বন্দীদের চাইতে বেশি আর্থিক মুক্তিপণ আদায় করেছিলেন যাতে করে আব্বাস রা. তাঁর চাচা হওয়ার কারণে স্বজন প্রীতির প্রশ্ন না উঠে। কিন্তু যারা আব্বাসকে রা. আটক করেছিলো তারা চেয়েছিলো রাসূল সা. যেন তাঁকে কোনো মুক্তিপণ ছাড়াই ছেড়ে দেন। কিন্তু রাসূল সা. সেটা অস্বীকার করেন এবং বলেনঃ "তাঁর ব্যাপারে এক দিরহামও ছাড় দিও না" ।১৬৬ এটাই হলো মানুষের প্রতি সম্মান ও ন্যায় প্রদর্শন। যেখানে পক্ষপাতিত্ব কিংবা স্বজনপ্রীতির কোনো সুযোগ নেই। এখানে আমরা দেখেছি কিভাবে রাসূল সা. গরিবদের সাথে রহমতপূর্ণ মানবিক আচরণ করেছিলেন। তিনি তাদের থেকে কোনো ধরনের মুক্তিপণ আদায় করেন নি। অথচ তাঁর ধনী চাচা থেকে তিনি অধিক পরিমাণ মুক্তিপণ আদায় করেছিলেন।১৬৭

এর মাধ্যমে তিনি পরবর্তীদের জন্য ইনসাফ, ন্যায়বিচার, দয়া ও মানবিকতার এক আদর্শ ও দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তাঁর ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেনঃ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾

"অর্থাৎ, আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য একমাত্র রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি" ।১৬৮

১৬৫ দ্রষ্টব্য, আশ-শামী, সুবুলুল হদা ওয়ার রাশাদ, ৪/১০৪-১০৫।

১৬৬ দ্রষ্টব্য, ইবনে কাছীর, আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৩/৩২৮।

১৬৭ দ্রষ্টব্য, ইবনে কাছীর, আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৩/২৯৯।

১৬৮ আল-আম্বিয়া: ১০৭।

৯. রাসূল সা. যখন মক্কাবাসীর কাছে তাদের বন্দীদের মুক্ত করতে মুক্তিপণ দেওয়ার খবর পৌঁছালেন, তখন তাঁর এই অবস্থান থেকেই দয়া ও মহানুভবতার এক উত্তম দৃষ্টান্ত ফুটে উঠেছিলো। রাসূলের সা. মেয়ে যায়নাবের রা. কাছে তাঁর বন্দী স্বামী আবুল আস ইবন রাবীর মুক্তিপণ প্রদানের খবর পাঠানো হলো যখন তিনি মক্কায় অবস্থান করছিলেন। আর তিনিই মুক্তিপণ হিসেবে তাঁর গলার হার পাঠিয়ে দেন যেটি তাঁর মা খাদিজাহ রা. তাঁকে আবুল আসের সাথে বিয়ের রাতে হাদিয়া স্বরূপ দিয়েছিলেন। রাসূল সা. হারটি দেখার সাথে সাথে তাঁর মন নম্র হয়ে গেলো। আর বললেন: "তোমরা চাইলে তার বন্দীকে ছেড়ে দিতে পারো, আর তার কাছ থেকে মুক্তিপণ হিসেবে নেওয়া হারটি তাকে ফেরত দিতে পারো"। তখন তারা বললো: "ঠিক আছে হে আল্লাহর রাসূল সা."। অতঃপর তারা তাঁর স্বামীকে ছেড়ে দিলো এবং হারটিও তাঁকে ফেরত দিয়ে দিলো।[১৬৯]

এই ধরনের মানবিকতা, নম্রতা ও মহানুভবতার উপমা ও ঘটনা পড়ে এমন একজন অসহায় মহিলার প্রতি দয়া অনুভব করে চোখের পানি ঝরায়নি এমন খুব কম লোকই পাওয়া যাবে। যে তাঁর স্বামীকে মুক্ত করার জন্য নিজের উপহার পাওয়া সবচে দামী জিনিসটা বিসর্জন দিয়েছিলো। যে উপহারটা সে তার বিয়ের রাতে পরলোকগত মায়ের কাছ থেকে পেয়েছিলো। তার সে উপহারটা (গলার হার) ছাড়া সহায় সম্পদ বলতে তার আর কিছুই ছিলো না। সে বাধ্য হয়ে তার স্বামীকে মুক্ত করার জন্য এই মূল্যবান উপহারটি দিয়েছিলো যা তার মায়ের ও বিয়ের স্মৃতি বহন করতো। যখন রাসূল সা. এই হারটি দেখলেন যেটি উম্মুল মুমিনীন খাদিজাহ রা. কে স্মরণ করিয়ে দেয় যার জন্য (জীবিত ও মৃত অবস্থায়) তাঁর অন্তরে আলাদা সম্মান ও মর্যাদা ছিলো, তখন তিনি সা. নিজের স্নেহময়ী মেয়ের জন্য স্নেহশীল না হয়ে পারলেন না। এরপরেও সেই হারটি ফিরিয়ে দিতে ও তার (জায়নাবের) স্বামীকে মুক্ত করার আদেশ না দিয়ে রাসূল সা. তাঁর সাহাবীদের রা. কাছে আবেদন করেছিলেন। কিন্তু সাহাবীগণ রা. কোনো কিছু চিন্তা না করেই রাসূলের সা. এই ইচ্ছা ও আগ্রহকে বাস্তবায়ন করতে অগ্রসর হলেন।

---

১৬৯ আবু দাউদ, সুনানু আবী দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, বাবু ফি ফিদাইল আছীর বিল মাল ৩/৬২, হাদীস নং ২৬৯২; আরো দ্রষ্টব্য, আশ-শামী, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪/১০৮; আল-ওয়াকেদী, আল-মাগাযী ১/১৩০-১৩১।

১. কুরাইশ বংশের কাফিরদের মধ্য থেকে যারা সবচেয়ে বেশি কুফরীতে লিপ্ত ছিলো, মুসলিমদের প্রতি সবচেয়ে বেশি শত্রুতা ও ঘৃণা পোষণ করতো, তাঁদেরকে বেশি কষ্ট দিতো এবং ইসলাম ও মুসলিমদের কুৎসা রটনা করতো তাদের অন্যতম ছিলো 'নাযার ইবন হারিস'। সে বদরের যুদ্ধবন্দীদের একজন ছিলো। যুদ্ধের আগে মুসলিমদের অধিক নির্যাতন ও কষ্ট দেওয়ার অপরাধে রাসূল সা. তাকে হত্যা করেছিলেন। পরে এই ঘটনা সম্পর্কে যখন তার বোন অবগত হলো তখন সে তার হত্যাকান্ড নিয়ে একটা কবিতা পাঠ করেছিলো। বর্ণিত আছে যে, যখন সেই কবিতাটি রাসূলের সা. কানে পৌঁছালো তখন তিনি বললেন: "যদি আমি তাকে হত্যা করার আগে এই কবিতাটি শুনতাম তাহলে আমি তার উপর অনুগ্রহ করতাম"। অর্থাৎ তাকে ক্ষমা করে মুক্ত করে দিতাম।[১৭০]

উপরিউক্ত ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাসূল সা. কর্তৃক এমন আরো একটি রহমতের মহৎ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যার মাধ্যমে বদরের আকাশ স্পষ্টভাবে আলোকিত হয়েছিলো, যখন রাসূল সা. হারিস ইবন আমির ইবন নাওফালকে হত্যা করতে নিষেধ করেছিলেন। পরে তার সাথে একজন লোকের দেখা হয় যে তাকে চিনতো না। কিন্তু সে তাকে হত্যা করে বসে। এই খবরটি যখন রাসূলের সা. কানে পৌঁছালো তখন তিনি বলেন: "তুমি হত্যা করার আগে যদি আমি তাকে পেতাম তাহলে তার স্ত্রীদের স্বার্থে আমি তাকে ছেড়ে দিতাম"। ইনিই হচ্ছেন দয়ার নবী যার কাছে শত্রুদের স্ত্রীদের খবর পর্যন্ত অজানা থাকতো না।[১৭১] এটা কেবল তাদের প্রতি নম্রতা, দয়া ও অনুগ্রহ থাকার কারণে। তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও ছিলো যে রাসূলকে সা. স্বয়ং কষ্ট দিয়েছিলো ও তরবারি দিয়ে হত্যা করার চেষ্টা করেছিলো। এত কিছুর পরেও রাসূল সা. ছিলেন তাদের প্রতি দয়ালু এবং তাদের সন্তান ও স্ত্রীদের ব্যাপারে চিন্তিত। নারীদের প্রতি মমত্ববোধ ও দয়াদ্র থাকার কারণে তিনি তার শত্রুকে হত্যা না করে দুনিয়াতে বেঁচে থাকার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। আমরা তাঁর অসিয়তনামা পড়লে জানতে পারবো যে, তিনি মুশরিকদের সন্তান ও স্ত্রীদের হত্যা করতে বারণ করেছিলেন। তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। বরং তা খাঁচায় বন্দী থাকা পাখির কাছে পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলো। তাঁর সৈনিকদের দ্বারা কোনো পাখি যুলমের

১৭০ দ্রষ্টব্য, ইবনে কাছীর, আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৩/৩০৬।

১৭১ আল-ওয়াকেদী, আল-মাগাযী ১/৮১।

শিকার হোক এটা তিনি সহ্য করতেন না। একদা রাসূল সা. তাঁর সাহাবীদের সাথে সফরে যাচ্ছিলেন। তখন সাহাবীগণ একটি পাখিকে তার ছানাসহ নীড়ে দেখতে পেলেন। একজন সাহাবী পাখিটির একটি ছানা নিয়ে নিলে পাখিটি আওয়াজ দিতে লাগলো। তখন রাসূল সা. বললেন: "যে এই পাখিটাকে তার ছানা নিয়ে কষ্ট দিলো সে যেনো ছানাটিকে তার কাছে ফিরিয়ে দেয়" ।১৭২

কোন পর্যায়ের দয়ালু হলে সামান্য একটি পাখির সুখ নিয়ে ভাবা সম্ভব সেটা এই ঘটনা থেকে বুঝা যায়। সামান্য একটা পাখির কষ্টও এই মহৎ সেনাপতির সা. কাছে অনেক বড় কষ্ট। কষ্টটা হলো এক পাখির যার সন্তানকে তার নীড় থেকে তুলে নেওয়া হয়। ইনি হচ্ছেন সেই দয়ালু সেনাপতি যিনি একটি পাখির জন্যও কষ্ট পান যার ছানাকে তার থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয়। অতঃপর সাহাবীগণকে রা. আদেশ দিলেন যেন তারা ঐ ছানাটিকে তার স্থানে রেখে দেয়। কী বিশেষণে এই ধরণের দয়াকে বিশেষায়িত করা যায়? এই পাখির চিৎকারকে যদি আমরা সন্তান হারা মায়েদের আর্তনাদের সাথে তুলনা করি, যারা তাদের সন্তানদের নিহত হতে কিংবা বন্দী হতে দেখছে অথবা নিজেদের সন্তানদের সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না, পাশাপাশি এমন কোনো দয়ালু ব্যক্তিকেও পাওয়া যাচ্ছে না যারা তাদের সন্তানদের দয়া করবে এবং তাদের কষ্টে ব্যথিত হবে। সর্বোপরি, এগুলো হচ্ছে মানবিকতার কিছু দৃষ্টান্ত যা বদরের দিন রাসূলের সা. পক্ষ থেকে তাঁর সৈনিক ও শত্রুদের সাথে আচরণের সময় ফুটে উঠে। যদিও এগুলো বদরের দিন রাসূলের সা. মানবিক আচরণকে চিত্রায়িত করে, বস্তুত এগুলো অন্যান্য যুদ্ধেও রাসূলের সা. মানবিক আচরণের একটি ছোট্ট নমুনা। আর বাস্তবে প্রয়োগ কোনো বিধানের চেয়েও শক্তিশালী প্রমাণ। কারণ বিধান হলো মাধ্যম আর প্রয়োগ হলো তার লক্ষ্য। অনেক সময় এমন হয় যে, বিধানগুলো কোনো বিষয় সুন্দরভাবে উত্থাপন করলেও সেগুলোর আসল মাহাত্ম্য বুঝা যায় তা প্রয়োগের সময়। রাসূলের সা. জীবন থেকে উপরিউক্ত আংশিক ও প্রায়োগিক চিত্রটি শুধুমাত্র যুদ্ধের সময় মানবিক আচরণের দৃষ্টান্ত পেশ করে না, বরং এটি সর্বাবস্থায় মানবিক আচরণের একটি সামগ্রিক ধারণা দেয়। যে যুদ্ধের সময় তার যোদ্ধা শত্রুকে যথাযথ মর্যাদা প্রদান করে, সে শান্তিপূর্ণ ও বেসামরিক অবস্থায় আরো অধিক সম্মান পাওয়ার উপযোগী। আল্লাহই তাওফীক্ব দানকারী।

১৭২ আবু দাউদ, সুনানু আবী দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, হাদিস নং ২৬৭৫, খন্ড ৩, পৃ. ৫৫।

উপসংহার:

এই গবেষণার শেষ পর্যায়ে এসে আমি এর উল্লেখযোগ্য সার-সংক্ষেপ পয়েন্ট আকারে নিম্নে উল্লেখ করতে চাই।

১. প্রায় ১৪০০ বছরেরও বেশি সময় যাবৎ সশস্ত্র সংঘাতের সময় মানবাধিকার সংক্রান্ত ইসলামি শরীয়াহ আইনের যে স্বীকৃত মূলনীতিগুলো রয়েছে তার তুলনায় "আন্তর্জাতিক মানবিক আইন" একটি নতুন সৃষ্ট পরিভাষা।

২. অন্যান্য জাতির সাথে মুসলিম উম্মাহর সম্পর্কের মূল হলো শান্তি। আর ইসলামে যুদ্ধ শুধু নেহায়েত প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে প্রযোজ্য। সুতরাং ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, সত্যকে সুরক্ষা দেওয়া কিংবা শত্রুদের প্রতিহত করা ব্যতিত যুদ্ধ হতে পারে না। কখনো যদি এসব প্রেক্ষাপটে যুদ্ধ বেঁধেই যায় তবে অবশ্যই এই পদ্ধতির মর্যাদা সংরক্ষণ করতে হবে এবং চরিত্র ও মূল্যবোধের বিষয়টি সমুন্নত রাখতে হবে।

৩. ইসলামের দৃষ্টিতে আন্তর্জাতিক সাধারণ আইন যেসব মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, মানবিক ঐক্য, ভালো কাজে সহযোগিতা, উদারতা, বিশ্বাসের স্বাধীনতা, ন্যায় বিচার ও নৈতিকতা সংরক্ষণপূর্বক সম-প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন ইত্যাদি। আর এই মূলনীতিগুলো কুরআন, সুন্নাহ এবং শরীয়াহ'র কোনো বাণী নসের সাথে সাংঘর্ষিক নয় এমন গ্রহণযোগ্য সামাজিক প্রথা থেকে উৎসারিত।

৪. ইসলামের আন্তর্জাতিক সাধারণ আইনে নৈতিকতার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। ব্যক্তিগত আচরণে নৈতিকতার লালন যেমন আবশ্যিক, অনুরূপভাবে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে পারস্পরিক আচরণের ক্ষেত্রে নৈতিকতার প্রতিফলন তার চেয়েও বেশি জরুরী।

৫. ইসলামের দৃষ্টিতে আন্তর্জাতিক সাধারণ আইনে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ (Self-Censorship) বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অনুসরণকে আবশ্যিক করেছে। সুতরাং অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে আচরণ ও সেখানে আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে এর প্রভাব প্রতিফলিত হবে।

৬. ইসলামের দৃষ্টিতে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় যে, "এটি হলো শরীয়াহ'র এমন সব মূলনীতির সমষ্টি, যার লক্ষ্য হচ্ছে সশস্ত্র সংঘাতের সময় মানুষের সুরক্ষা দেওয়া ও তাদের অধিকার সংরক্ষণ করা"।

৭. আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের ক্ষেত্রে ইসলামের দু'টি মৌলিক বিষয়ে আমি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। তাহলো:

ক. যুদ্ধ-বিগ্রহ কেবল অত্যাবশ্যকীয় অবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা আবশ্যক।

খ. যুদ্ধকালীন সময়ে মানবিক মর্যাদার বিষয়ে মানবিক থাকা জরুরী।

৮. ইসলাম চরিত্রের অবস্থানকে মজবুত করেছে। কেন না তা স্থান-কাল ভেদে ব্যক্তি ও গোষ্ঠিসমূহকে মার্জিতকরণে প্রভাববিস্তারকারী এবং কার্যকর ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে যখন অস্ত্রের ঝনঝনানী বেড়ে যায়, আইন-শৃংখলা বিনষ্ট হয়। কিন্তু চরিত্র যদি উন্নত হয়, তাহলে কারো অধিকার ক্ষুন্ন হয় না। বরং মানুষের নিকট মানুষের সম্মান বৃদ্ধি পায়। তার মর্যাদা বেড়ে যায়। এটিই হলো ইসলামের আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের মূল ভিত্তি।

৯. যুদ্ধে আহত ও আক্রান্ত ব্যক্তিরা আবশ্যিকভাবে যেসব সুরক্ষা ও মানবিক আচরণ পাবে আমি এই গবেষণায় তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি। সুতরাং ইসলামের আন্তর্জাতিক মানবিক আইন অনুযায়ী শত্রুপক্ষের আহত ব্যক্তিকে হত্যা করা কিংবা তাকে কষ্ট দেওয়া বৈধ নয়। অনুরূপভাবে কোনো চিকিৎসা বা ওষুধপত্র না দিয়ে তাকে কষ্টের মধ্যে ফেলে রাখাও বৈধ নয়।

১০. যুদ্ধবন্দীদের অধিকারসমূহও আমি বিশদভাবে বর্ণনা করেছি, যার অগ্রভাগে রয়েছে এ সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ সা. এর উপদেশ। তিনি বলেছেন: "তোমরা যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে হিতাকাংখী হও"। এটি এমন এক ব্যাপক উপদেশ যাতে মৌখিক ও প্রায়োগিক এবং জাগতিক ও আধ্যাত্মিক সব ধরনের কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

১১. অনুরূপভাবে বন্দী অবস্থায় একজন যুদ্ধবন্দীর নিজ ধর্মের আচার অনুষ্ঠান পালনের অধিকার ও তাকে নিজ ধর্ম পরিবর্তনের জন্য জবরদস্তি করা বৈধ না হওয়ার বিষয়ের প্রতিও আমি ইঙ্গিত করেছি।

১২. শত্রুপক্ষ তাদের নিকট আটক মুসলিম কোনো বন্দীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলেও ইসলাম যুদ্ধবন্দীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে বলে না - এবিষয়ে আমি আলোকপাত করেছি।

১৩. অনুরূপভাবে আমি উল্লেখ করেছি একই পরিবারের অর্ন্তভূক্ত যুদ্ধবন্দীকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। সুতরাং মা ও তার সন্তান, পিতা ও তার সন্তান, ভাই-বোন ও এ জাতিয়দের একজনকে অপরজন থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না।

১৪. বন্দীদের অধিকার বিষয়ক আলোচনায় আমি উল্লেখ করেছি যে, ইসলাম সৈন্যদের পক্ষ থেকে আটককৃত বন্দীদের উপর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখাতে নিষেধ করেছে। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা অন্যায্য, অসামঞ্জস্য আবেগের ফল, বিজয়ের উন্মাদনা ও ক্রোধে প্রসূত হয়ে থাকে। ফলে তা যুলুম ও বাড়াবাড়িতে পরিণত হয়। আমি আরো বিশ্লেষন করেছি, বন্দীর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার সৈনিকদের উপর না দিয়ে তা সেনা প্রধানের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিৎ। যাতে অমানবিক আচরণের শিকার হয়ে বন্দীরা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

১৫. আমি আরো উল্লেখ করেছি, বন্দীদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বৈধ ইখতিয়ার রয়েছে একমাত্র শাসকের। তা ক্ষমা প্রদর্শণ কিংবা সম্পদের মাধ্যমে মুক্তিপণ গ্রহণ যাই হোক না কেন। বন্দীদের হত্যা করার বিষয়ে আলিমদের মতানৈক্যের ব্যাপারটি উভয় পক্ষের বক্তব্যসহ আলোচনা করেছি। আমি আরো বলেছি, বৈশ্বিক রীতি-নীতিতে যেখানে বন্দী হত্যা নিষিদ্ধ ইসলামি শরীয়াহ এই রীতির প্রয়োগকে সর্বাগ্রেই স্বাগত জানায় এবং তাকে ধারণ করে। কারণ এতে সামগ্রিক কল্যাণ এবং মানব মর্যাদা নিহিত রয়েছে।

১৬. অতঃপর যুদ্ধে নিহতদের অধিকারসমূহ এবং জীবিত ও মৃত অবস্থায় মানুষকে সম্মান করার ব্যাপারে ইসলামের আগ্রহের বিষয়টি আলোচনা করেছি। আর আমি এই বিষয়টির প্রতিও ইঙ্গিত করেছি যে, যুদ্ধের

ময়দানে মৃত মানুষকে সম্মান জানানোর একটি হলো, তার মৃতদেহের প্রতি সম্মান প্রদর্শণ ও তার মর্যাদার যথাযথ মূল্যায়ন। আর এই সম্মানের প্রকরনের মধ্যে রয়েছে তার অঙ্গবিকৃত বৈধ না হওয়া অথবা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তার মাথাকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে না যাওয়া।

১৭. মানুষের মর্যাদা সংরক্ষণের স্বার্থে ইসলামের আন্তর্জাতিক মানবিক আইন নিহত ব্যক্তি যে ধর্মেরই হোক না কেন, তাকে সমাহিত করার নির্দেশ দেয়। তাছাড়া শত্রুপক্ষের নিহতের মরদেহ ফেলে না রাখতেও উৎসাহ দেয়। কারণ প্রতিটি ব্যক্তির মানুষ হিসেবে মানবিক মর্যাদা রয়েছে।

১৮. বেসামরিক নাগরিকদের অধিকারের আলোচনায় আমি উল্লেখ করেছি যে, ইসলামের আন্তর্জাতিক মানবিক আইন সামরিক ও বেসামরিক লোকদের মাঝে পার্থক্য করে। এ কারণেই সেটি নারী, বৃদ্ধ, শিশু, পাদ্রী, কৃষক ও এ জাতিয়দের উপর আক্রমণ করতে নিষেধ করে । একইভাবে তাদের বাসস্থান, উপাসনালয়, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র তথা লাইব্রেরী, শিক্ষালয় ও অনুরূপ স্থাপনাসমূহে হামলার অনুমোদন করে না।

১৯. বদর যুদ্ধের প্রায়োগিক দিক আলোচনায় একথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. তাঁর দাওয়াতকে কেবল কথামালার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখতে কতটা ব্যাকুল ছিলেন। বরং তিনি যা বলছেন এবং যে বিষয়ের প্রতি দাওয়াত দিচ্ছেন তা বাস্তবে প্রয়োগ করতে সবচেয়ে অগ্রগামী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর আহূত মূলনীতিকে স্পষ্ট করার জন্য তিনি কথা ও কাজকে পরস্পরের সাথে গেঁথে রাখতেন।

২০. রাসূলুল্লাহ সা. তাঁর সাহাবীদের সাথে এমন নম্র আচরণ করতেন যেন তিনি তাদেরই একজন। আর এটিই হচ্ছে অন্যকে সম্মান করা, মানুষের সাথে ন্যায় পরায়ণতা অবলম্বন, সেনাপতি তার সৈন্যদের সাথে নম্রতা দেখানো সর্বোপরি সকলের সাথে উন্নত মানবিক আচরণের সূচনা। একজন সেনাপতি যদি তার সৈনিকের অন্তরে এসব গুনের বিকাশ ঘটাতে পারেন তা হলে সে তার প্রবৃত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার অনুষঙ্গগুলো ধারণ করতে সক্ষম হবেন। ফলে সে অত্যাচার করবে না, সীমালঙ্ঘন করবে না এবং অন্যকে সম্মান করা তার শীর্ষ অগ্রাধিকারের মধ্যে থাকবে।

২১. যখন আমরা স্থান-কাল-পাত্র ভেদে মানুষের প্রতি মানুষ হিসেবে পরিপূর্ণভাবে দয়া প্রদর্শণ করতে পারবো তবে তা হবে ইসলামের আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের সাফল্যের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। এটি ব্যতীত আন্তর্জাতিক মানবিক আইন আধুনিক জীবনে প্রয়োগ তো দূরের কথা নিজের উপস্থাপনাও করতে পারবে না। তাই বিষয়টিকে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনে কেন্দ্রীভূত করা ও গুরুত্বারোপ করা অত্যন্ত জরুরী।

২২. বদর যুদ্ধে বন্দীদের সাথে রাসুল সা. এর ব্যবহারের বিষয়টি উল্লেখ করে আমি অনেক মহৎ মানবিক দিক ফুটিয়ে তুলেছি যেগুলো তাদের সাথে ভালো আচরণের কথা স্পষ্ট করে। আর তা হচ্ছে:- বন্দীদেরকে সাহাবীদের খাবারের চাইতেও উন্নতমানের খাবার পরিবেশন, নিজেরা পায়ে হেঁটে তাদেরকে বাহনের উপর আরোহণ করানো, তাদেরকে মানসম্মত পোশাক প্রদানে উৎসাহিত করা, যাদের কন্যা সন্তান রয়েছে বলে আল্লাহর রাসূল সা. জানতে পেরেছেন সেইসব কন্যাসন্তানের কল্যাণের কথা চিন্তা করে তাদেরকে মুক্ত করার ইঙ্গিত দেয়া। অধিকন্তু তিনি তাদের অনেকের সাথে অতিথিসূলভ আচরণ করেছেন। যেমন: তাদের মাথায় তেল ব্যবহার, চুল আঁচড়ানো এবং তাদেরকে নিজেদের ঘরে অবস্থানের সুযোগ করে দেওয়া।

২৩. সার্বিক বিচারে আমরা বলতে পারি, যুদ্ধরত শত্রুপক্ষের সাথে বদর যুদ্ধে রহমতের প্রায়োগিক দৃশ্যটি ছিল কার্যত একজন পরাজিত, দুর্বল, বন্দী শত্রুর সাথে যে ধরনের আচরণ করা হয় তার উজ্জল দৃষ্টান্ত। এবার আপনি ভাবুন, উত্তম আচরণ ও যত্নশীলতার আর কি উদাহরণ চান?

২৪. বদর যুদ্ধে আমরা যে ধরনের আচরণ প্রত্যক্ষ করেছি, সেটি একটি আদর্শস্থানীয় দৃষ্টান্ত যা একজন গবেষকের সামনে রাসূলের সা. যুদ্ধগুলোতে মানবিক আচরণের মাহাত্ম্যকে ফুটিয়ে তুলে। তার চেয়ে বড় কথা হলো, এর মাধ্যমে একজন মানুষ ইসলাম ধর্মে মানুষের কি মর্যাদা আছে তা জানতে পারবে। যিনি এমন একজন মানুষকে মর্যাদা দিবেন যখন সে শত্রু হিসেবে তাকে হত্যা করতে তলোয়ার নিয়ে উদ্যত, তাঁর কাছ থেকে একজন বেসামরিক ও শান্তিপ্রিয় লোক এর চাইতেও বেশি মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য।

২৫. আমি ইতিমধ্যেই বর্ণনা করেছি যে, যুদ্ধক্ষত্রে মানুষের অধিকার রক্ষার যে নির্ধারিত মূলনীতিগুলো আছে সেগুলো আল্লাহ প্রদত্ত কিছু শিক্ষা। আর যে ব্যক্তি সেগুলোর বিরোধিতা করবে সে দু'ধরনের শাস্তির সম্মুখীন হবে। এক, ইহকালীন শাস্তি। সেটা হলো এমন শাস্তি যা এমন সৈনিকের উপর আরোপ করা হয় যে যুদ্ধের প্রচলিত নিয়মের বিরোধিতা করে। দুই, আল্লাহর পক্ষ থেকে পরকালীন শাস্তি। বরং দুনিয়াতেও এর প্রভাব বিদ্যমান। যেমনটি আল্লাহ ইহকালীন তাঁর প্রদত্ত শাস্তির ব্যাপারে বলছেনঃ

﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾

অর্থাৎ,"তোমাদের কর্মের ফলেই তোমাদের কাছে মুসিবাত আসে" ।[১৭৩] আর রাসূল সা. বলেছেন: "দয়ালুদের কে আল্লাহ দয়া করেন" । এর বিপরীত অর্থও প্রযোজ্য।

২৬. আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের মূলনীতিগুলো আল্লাহ প্রদত্ত বিধান হিসেবে পরিগণিত হওয়ার কারণে সেগুলো ইসলামি শারিয়াহ'র একটা বড় অংশ জুড়ে বিস্তৃত এবং তার বাস্তবায়নও অধিকতর কর্তব্যের অন্তর্গত। যে সেগুলোকে অবহেলা করবে সে দু'ধরনের প্রতিদানের সম্মুখীন হবে, যেমনটি আগেও বলা হয়েছে। প্রথমটি হবে পার্থিব জগতে শাসকের হাতে আর দ্বিতীয়টি হবে পরকালে। এই দৃষ্টিভঙ্গী মুসলিম যোদ্ধাদেরকে এই সব মূলনীতিকে আঁকড়ে ধরতে বাধ্য করে। যদিও সে দায়িত্বশীলের অবহেলা কিংবা দুর্বলতার কারণে ইহকালীন শাস্তি থেকে পার পেয়ে যায় কিন্তু সে পরকালিন শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবে না।

وصلى الله وسلم على نبينا محمد

১৭৩ সূরা শুরা-৩০

গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্য সূত্র

১. ইবনুল আছীর, আন-নিহায়াতু ফি গারীবিল হাদীসি ওয়াল আছার, সম্পাদনা: তাহির আহমদ আয-যা'বী ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ (মক্কা: দারুল বায, তা. বি)।

২. ইবনুল কাইয়্যিম, যাদুল মা'আদ ফি হাদয়ি খাইরিল ইবাদ, দ্বিতীয় সংস্করণ (বৈরুত: মুআস্সাতুর রিসালাহ, ১৪০৫হি.)।

৩. ইবনে হাজার, আল-ইসাবা ফি মা'রিফাতিস সাহাবা (বৈরুত: দারুল কুতবিল ইলমিয়্যাহ, তা.বি)।

৪. ইবনে সাদ, আত-তাবাকাতুল কুবরা (বৈরুত: দারু সাদির, তা. বি)।

৫. ইবনে আতিয়্যাহ, আল-মুহাররির আল-ওয়াজীয ফী তাফসীরিল কিতাবিল আযীয, সম্পাদনা: আবদুল আল-সাইয়্যিদ ইবরাহীম, প্রথম সংস্করণ (কাতারের ধর্মবিষয়ক অধিদপ্তর, ১৪১২ হি.)।

৬. ইবনে কুদামা, আল-কাফী, সম্পাদনা: যুহাইর আশ-শাভীশ, পঞ্চম সংস্করণ, (বৈরুত: মাকতাবাতুল ইসলামি, ১৪০৮ হি.)।

৭. ইবনে কুদামা, আল-মুগনী (রিয়াদ: মাকতাবাতুর রিয়াদ আল-হাদীসাহ, তা. বি.)।

৮. ইবনে কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, সম্পাদনা: আবদুল্লাহ ইবন আবদুল মুহসিন আত-তুর্কী, প্রথম সংস্করণ (কায়রো: দারু হিজর, ১৪১৭ হি.)।

৯. ইবনে কাছীর, তাফসীরে ইবনে কাছীর, সংস্করণ নাই, (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৪০১ হি.)।

১০. ইবনে হিশাম, আস-সীরাহ আন-নাবভীয়্যাহ, সম্পাদনা: আদিল আহমেদ আবদুল মওজূদ ও সহকর্মী, প্রথম সংস্করণ (রিয়াদ: মাকতাবাতুল আবিকান, ১৪১৮ হি.)।

১১. আবু হাইয়্যান আল-আন্দালুসী, তাফসিরুল বাহরিল মুহীত, দ্বিতীয় সংস্করণ (বৈরুত: প্রকাশ, প্রচার ও বিতরণে দারুল ফিকর, ১৪০৩ হি.)।

১২. আবু দাউদ, সুনান আবী দাউদ, সম্পাদনা: মুহাম্মদ মুহিউদ্দিন আবদুল হামিদ (বৈরুত: দারুল ফিকর, তা.বি.)।

১৩. আবু উবাইদ আল-কাসিম ইবন সালাম, আল-আমওয়াল, সম্পাদনা: মুহাম্মদ খলীল হারাস (কায়রো: মাকতাবাতুল কুল্লিয়্যাত আল-আযহারিয়্যাহ, ১৩৯৬ হি.)।

১৪. আবু ইউসুপ ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম, আল-খারাজ, ষষ্ঠ সংস্করণ, (কায়রো: আল-মাতবাআ' আস-সালাফিয়্যাহ, ১৩৯৭ হি.)।

১৫. ইহসান আল-হিন্দী, আহকামুল হারবি ওয়াস সালাম ফী দাওলাতিল ইসলাম, প্রথম সংস্করণ (দামেস্ক : প্র.বি, ১৯৯৩ খৃ.)।

১৬. ইহসান আল-হিন্দী, আল-ইসলাম ওয়াল কানূন আদ-দুওয়ালী, প্রথম সংস্করণ (দামেস্ক: দারু তালাস লিদ দিরাসাতি ওয়াত তারজমা ওয়ান নাশর, ১৯৮৯ খৃ.)।

১৭. আহমাদ ইবনুল হুসাইন আল-বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, সম্পাদনাঃ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির আতা (মক্কাঃ দারুল বায, ১৪১৪ হি.)।

১৮. আহমদ ইবনে হাম্বল, মুসনাদে আল-ইমাম আহমদ, সম্পাদনা: ড. আবদুল্লাহ আত-তুর্কী ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ, প্রথম সংস্করণ (বৈরুত: মুআসসাতুর রিসালাহ, ১৪১৭ হি.)।

১৯. আহমদ ইবনে হাম্বল, মুসনাদে আল-ইমাম আহমদ, (মিসর: মুআসসাতু করতোবা, তা.বি.)।

২০. ইসমাইল আবূ শারীয়াহ, নাযরিয়্যাতুল হারবি ফিল ইসলাম, প্রথম সংস্করণ (কুয়েত: মাকতাবাতুল ফালাহ, ১৪০১ হি.)।

২১. আল-বুখারী, ইবনে হাজারের ফাতহুল বারীসহ প্রকাশিত সহীহ আল-বুখারী (রিয়াদ: তাওযীউর রিয়াসাহ আল-'আম্মাহ লিল ইফতা ওয়াল বুহূস আল-ইলমিয়্যাহ, রিয়াদ)।

২২. বায়যাবী, তাফসীর আল-বায়যাবী, মুহিউদ্দিন যাদাহ এর টীকাসহ প্রকাশিত, (বৈরুত: দারু সাদির, তা.বি.)।

২৩. আল-বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা (বৈরুত: দারুল ফিকর, তা.বি.)।

২৪. আল-তিরমিযী, সুনান আল-তিরমিযী, সম্পাদনা: আহমদ মুহাম্মদ শাকির ও অন্যন্য (বৈরুত:দারু ইহয়ায়িত তুরাছ আল-আরবি, তা.বি.)।

২৫. আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন (বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ, তা.বি.)।

২৬. দারো কুতনী, সুনান দারো কুতনী, আল-মুগনী আলা সুনানি আদ-দারা কুতনী এর টীকাসহ প্রকাশিত (পাকিস্তান: আলহাদীস একাডেমী, তা.বি.)।

২৭. আল-যারাকশী (বদরুদ্দিন মুহাম্মদ আশ-শাফিঈ), আল-মানছুর ফিল কাওয়ায়িদ, সম্পাদনা, তাইসীর ফায়িক আহমদ মাহমুদ, প্রথম সংস্করণের ভিত্তিতে সচিত্র সংস্করণ (কুয়েত: ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুউন আল্ ইসলামিয়্যাহ্, ১৪০২ হি.)।

২৮. আয্-যামাখশারী, আল কাশশাফ আন হাকায়িকিত তানযিল... সম্পদনা: মুহাম্মদ আল-সাদিক কামহাবী, সংস্করণ বিহীন (মিসর: মাকতাবাতু মুস্তফা আল-বাবী আল-হালাবী, ১৩৯২ হি.)।

২৯. আস-সারাখসী, "আল-মাবসূত" সংস্করণ বিহীন (বৈরুত:দারুল মা'রিফাহ ১৪০৬ হি.)।

৩০. আস-সাদী, আল-মুখতারাত আল জালিয়্যাহ মিনাল মাসায়িল আল ফিকহিয়্যাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ (রিয়াদ: আররিয়াসাহ আল-আম্মাহ লিল-বুহূছিল ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতাহ ১৪০৫হি.)।

৩১. আস-সাদী, তাফসীরুস সাদী, (জেদ্দা, দারুল মাদানী, ১৪০৮ হি.)।

৩২. আশ-শাতিবী, আল-মুওয়াফাকাত ফী উসূলিশ শারীয়াহ, আবদুল্লাহ দারায এর টীকাসহ দ্বিতীয় সংস্করণ (মিসর: আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাহ, ১৩৯৫ হি.)।

৩৩. আশ-শাওকানী, ফাতহুল কাদীর, সম্পাদনা: আবদুর রহমান উমাইরা, দ্বিতীয় সংস্করণ (আল মানসূরা: দারুল ওয়াফা লিত-তাবাআহ ওয়ান নাসর, ১৪১৮ হি.)।

৩৪. আস-সানাআনী, সুবুলুস সালাম শারহি বুলুগিল মুরাম (রিয়াদ: মুহাম্মদ ইবন সাউদ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৯৭ হি.)।

৩৫. তাবারী, তাফসীর আল-তাবারী (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৪০৫ হি.)।

৩৬. তাবারী, তাফসীর আল-তাবারী, সম্পাদনা: আবদুল্লাহ আত-তুর্কী, প্রথম সংস্করণ (কায়রো: দারু হিজর, ১৪২২ হি.)।

৩৭. আল-গাযালী, ফিকহুস সীরাহ, প্রথম সংস্করণ (কায়রো: মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাহ, ১৩৫৬ হি.) ।

৩৮. কুরতুবী, তাফসীর আল-কুরতুবী, দ্বিতীয় সংস্করণ (কায়রো: দারুশ শা'ব, ১৩৭২ হি.) ।

৩৯. আল-মাওয়ার্দী, আল-আহকাম আস-সুলতানিয়্যাহ, সম্পাদনা: ইয়াহইয়া মুখতার গাজাভী, তৃতীয় সংস্করণ (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৪০৯ হি.)।

৪০. আল-মারাগী, তাফসীরুল মারাগী, দ্বিতীয় সংস্করণ (বৈরুত: দারু ইহয়ায়িত তুরাছিল আরবি, ১৯৮৫ খৃ.)।

৪১. আল-ওয়াকেদী, কিতাবুল মাগাযী, সম্পাদনা: মার্সডেন জোনস, তৃতীয় সংস্করণ (বৈরুত: 'আলামুল কুতুব, ১৪০৪ হি.)।

৪২. হাসান আবু গুদ্দাহ, কাদায়া ফিকহিয়্যাহ ফিল 'আলাকাত দুওয়ালিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, (রিয়াদ: মাকতাবাতুল আবিকান, ১৪২০ হি.)।

৪৩. সাঈদ ইসমাইল সিনী, হাকীকাতুল আলাকা বাইনাল মুসলিমীন ওয়া গাইরিল মুসলিমীন, প্রথম সংস্করণ (বৈরুত: মুআসসাতুর রিসালাহ, ১৪২০ হি.)।

৪৪. সুলায়মান আত-তাবারানী, আল-মুজামুস সাগীর, সম্পাদনা: মুহাম্মদ মাহমুদ আল-হাজ্ব আমরীর, প্রথম সংস্করণ (বৈরুত: আল-মাকতাবাতুল ইসলামি, ১৪০৫ হি.)।

৪৫. সুলায়মান আত-তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর, সম্পাদনা: হামদি ইবন আবদিল মাজীদ আস-সালাফী, দ্বিতীয় সংস্করণ (মূসিল: মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, ১৪০৪ হি.)।

৪৬. শরীফ আটলাস, সম্পাদক, আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের মূলনীতি শীর্ষক জন পিকটেট এর লেকচার-সমুহ, তৃতীয় সংস্করণ (বৈরুত: দারুল মুসতাকবাল আল-আরবি, ২০০৩ খৃ.)।

৪৭. সালিহ আশ-শাছরী, হুকুকুল আছরা ফিল ইসলাম (ইন্টারনেটে আল-ইসলাম ওয়েবসাইটে প্রকাশিত গবেষণা)।

৪৮. আবদুল হাই হিজাযী, আল-মাদখাল লি দিরাসাতিল উলূম আল-কানূনিয়্যাহ (কুয়েত:কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭২ খৃ.)।

৪৯. আবদুর রাজ্জাক, আল-মুসান্নাফ, সম্পাদনা: হাবীব আল আযামী, দ্বিতীয় সংস্করণ (বৈরুত: আল-মাকতাবুল ইসলামি ১৪০৩ হি.)।

৫০. আবদুল গনি আবদুল হামীদ মাহমূদ, হিমায়াতু দাহায়া আন-নায্'আত আল মসাল্লাহা ফিল কানূনিদ দুওয়ালি আল ইনসানী ওয়াশ শারীয়াহ আল ইসলামিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ (কায়রো: আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি, ২০০০ খৃ.)।

৫১. আবদুল করিম যায়দান, নাজরাতুন ফিশ শারীয়াহ আল ইসলামিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ (বৈরুত: মুআসসাতুর রিসালাহ, ১৪২১ হি.)।

৫২. ড. আবদল্লাহ আত-তুর্কী, তাওজীহাতুস সুন্নাহ ফি মাজালিত তাশরী' আল হারবী, 'আল-আসালাহ' নামক জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধ, আল মুলতাকা আস-সাদিস আশারা লিল ফিকরিল ইসলামি, তিলমিসান, আলজেরিয়া ৬-১৩/১০/১৪০২।

৫৩. আলী আল-হাইছামী, মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ (বৈরুত: দারুল কিতাব আল-আরবি, ১৪০৭ হি.)।

৫৪. উমর আল আশকার, তারীখুল ফিকহিল ইসলামি, তৃতীয় সংস্করণ (কুয়েত: মাকতাবাতুল ফালাহ, ১৪১৩ হি.)।

৫৫. মালেক ইবনে আনাস, আল-ইমাম আল-মুওয়াত্তা, সপ্তম সংস্করণ (বৈরুত: দারুন নাফায়িস, ১৪০৪ হি.)।

৫৬. মালেক ইবনে আনাস, আল-ইমাম আল মুদাওয়ানা, সম্পাদনা: আস-সাইয়্যিদ আ'লী ইবনে আস-সাইয়্যিদ আবদুর রহমান আল হাশেম (আরব আমীরাতের রাষ্ট্রপতি শায়খ যায়েদের অর্থায়নে প্রকাশিত, ১৪২২ হি.)।

৫৭. মুহাম্মদ আবু যাহরাহ, নাযারিয়্যাতুল হারবি ফিল ইসলাম (মিসর: ওয়াকফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উচ্চতর পরিষদ, ১৩৮০ হি.)।

৫৮. মুহাম্মদ আত-তাহির ইবনে আশূর, মাকাসিদুশ শরীয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ, সম্পাদনা: মুহাম্মদ তাহির আল মিসাবী, দ্বিতীয় সংস্করণ (জর্দান: দারুন নাফায়িস লিন নাশরি ওয়াত তাওযী', ১৪২১ হি.)

৫৯. মুহাম্মদ ইবনে হাসান আশ-শায়বানী, আস-সিয়ার আল-কাবীর ওয়া শারহূ লিস-সারাখসী, সম্পাদনা: মুহাম্মদ হাসান মুহাম্মদ আশ-শাফিঈ, প্রথম সংস্করণ (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৭হি.)।

৬০. মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান, সহীহ ইবনু হিব্বান, সম্পাদনা: শুয়াইব আল-আরনাউত, দ্বিতীয় সংস্করণ (বৈরুত: মুআসসাতুর রিসালাহ, ১৪১৪ হি.)।

৬১. মুহাম্মদ ইবনে ইউসুপ আস-সালিহী, সূবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতি খাইরিল ইবাদ, সম্পাদনা: ফাহীম মুহাম্মদ শালতুত ও তার সহকর্মীবৃন্দ (কায়রো: আল-মাজলিসুল আলা লিশ-শুউন আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৪১৩ হি.)।

৬২. মুহাম্মদ আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ আবদুর রহীম আল মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী বিশারহি জামেঈ তিরমিযী (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ)।

৬৩. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম, সম্পাদনা: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী (কায়রো: দারু ইহয়া আল-কুতুব আল-আরবিয়্যাহ)।

৬৪. মুস্তফা আস-সিবাঈ, নিযামুস সিলমী ওয়াল হারবি ফিল ইসলাম, দ্বিতীয় সংস্করণ (রিয়াদ: মাকতাবাতুল ওয়াররাক, ১৪১৯ হি.)।

৬৫. ওয়াকফ ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কুয়েত, আল মাউসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ আল কুয়েতিয়্যাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ (বৈরুত: দারু ইহয়ায়িত তুরাছিল আরবি, ১৪১৯ হি.)।

৬৬. ওয়াহবাতুয যুহাইলী, আছারুল হারবি ফিল ফিকহিল ইসলামি, তৃতীয় সংস্করণ (দামিস্ক: দারুল ফিকর, ১৪১৯ হি.)।

International Islamic University Chittagong
Kumira, Chittagong-4318, Bangladesh
Tel.: +88-03042-51154-61
Fax.: 03042 51160
Email: info@iiuc.ac.bd

International Committee of the Red Cross
House 72, Road 18, Block J, Banani
Dhaka 1213, Bangladesh
Tel: +880 2 8837461, Fax: +880 2 8837462
Email: dhaka@icrc.org www.icrc.org

facebook.com/icrc
twitter.com/icrc
instagram.com/icrc

ICRC

আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি
বাড়ি ৭২, রোড ১৮, ব্লক জে, বনানী, ঢাকা ১২১৩
টেলিফোন +৮৮ ০২ ৮৮৩৭৪৬১, ৮৮৩৫৫১৫
ফ্যাক্স +৮৮ ০২ ৮৮৩৭৪৬২
ইমেইল dhaka@icrc.org, www.icrc.org/bd
© আইসিআরসি, ফেব্রুয়ারী ২০১৯